ঘটনা যখন রহস্যজনক

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

নবপত্র প্রকাশন
৫৯, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ২৩ শে জানুয়ারী, ১৯৫৫

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৫৯, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক : নিউ এজ প্রিন্টার্স
৫৯, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

শ্রীমতী মীনা বেগম

কল্যাণীয়াসু

স্বনামখ্যাত প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার কর্ণেল নীলাদ্রি সরকারের ঘরে ঢুকেই আমি হতবাক। টেকো দাড়িয়াল বুড়ো চাঁদের হাট বসিয়ে মৌজ করছেন। এ যে জলে শিলা ভেসে যায়, বানরে সঙ্গীত গায়, দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।

না, কর্ণেল বুড়ো মোটেও বদমেজাজী মানুষ নন। কিংবা প্রেমে ব্যর্থ, তাই নারী-বিদ্বেষী গোঁয়ার গোবিন্দও নন। বরং সুরসিক বলে খ্যাতি আছে ওঁর। বিশেষ করে সুন্দরী যুবতীদের প্রতি ওঁর পক্ষপাতদুষ্ট স্নেহ সুপ্রচুর। কিন্তু, আমার বিস্ময়ের কারণ অন্য। ইলিয়ট রোডের এই ফ্ল্যাটে অনেকদিন ধরে যাতায়াত করছি, কখনও কোন সুন্দরী যুবতীকে এখানে পদার্পণ করতে দেখিনি। যাঁরা সচরাচর আসেন, তাঁরা রাশভারি মানুষ সব। বিষয়ী এবং কেজো প্রকৃতির লোক। কোন না কোন গূঢ় মতলব নিয়েই তাঁরা আসেন।

আজ যাদের দেখছি, এরা একেবারে উল্টো প্রকৃতির। [illegible] পলকেই আন্দাজ করেছি—খবরের কাগজের রিপোর্টারের অভ্যাসলব্ধ চাতুর্যেই, এরা সংখ্যায় তিন এবং আঠারো থেকে বাইশটি [illegible] ঋতু দেখেছে। প্রত্যেকেরই চেহারায় উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিক্কণ মেদ ও শ্রী পরিস্ফুট। এরা কথায় কথায় প্রচুর হাসছে। প্রচুর কথা বলার চেষ্টা করছে। এবং কর্ণেল হংস মধ্যে বক যথা বসে রয়েছেন।

আমাকে দেখেই অবশ্য কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধতা জাগল। তারপর কর্ণেল খুব খুশি দেখিয়ে বলে উঠলেন—হ্যালো ডার্লিং। এসো, এসো, তোমার কথাই ভাবছিলুম।

নিছক মিথ্যা, তাতে ভুল নেই। গম্ভীর হয়ে সামান্য দূরে একটা

গদীআঁটা চেয়ারে বসে পড়লুম। তারপর বললুম—আমার কথা ভাববার ফুরসৎ পাচ্ছিলেন এতে সন্দেহ আছে।

কর্ণেল হাততালি দিয়ে উচ্চহাস্য করলেন।—ব্র্যাভো জয়ন্ত! ঠিকই বলেছ।

যুবতী তিনটি আমাকে দেখছিল। আমি সামনের টেবিলে চোখ রাখলুম। তারপর কর্ণেলকে উঠতে দেখলুম। আনুষ্ঠানিকভাবে একটা কিছু করবেন মনে হল।

হুঁ, ঠিক তাই।—মাই ডিয়ার লেডিস এ্যাণ্ড জেণ্টলমেন......

একজন মেয়ে বলে উঠল—কর্ণেল, কর্ণেল! এখানে জেণ্টলম্যান কিন্তু একজনই।

অন্য একজন বলল—সোনালী, তুই কিচ্ছু বুঝিস না। কর্ণেল নিজেকেও কাউণ্ট করছেন যে!

আবার প্রচুর হাসিতে ঘর ভরে গেল। কর্ণেল গলা ঝেড়ে শুরু করলেন—যাই হোক, পরিচয় করিয়ে দেওয়া গৃহকর্তা হিসেবে আমার পবিত্র ও নৈতিক দায়িত্ব। ভদ্রমহোদয়গণ! ইনি হচ্ছেন, দৈনিক সত্যসেবকের স্বনামধন্য রিপোর্টার জয়ন্ত চৌধুরী।

আমার চোখের ভুল হতেও পারে, হয়তো ইচ্ছাকৃত চিন্তা বা উইশফুল থিংকিং গোছের কিছু, মনে হল ওদের চোখে বিস্ময় মেশানো শ্রদ্ধা ফুটে উঠল।

—আর, মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণ। ইনি সোনালী ব্যানার্জি, ইনি রঞ্জা চ্যাটার্জি—সোনালীর মাসতুতো বোন। আর ইনি দীপ্তি চক্রবর্তী। দুজনের বন্ধু, সহপাঠিনী। এঁরা কিন্তু কেউ কলকাতার বাসিন্দা নন। রানীডিহি নামে প্রখ্যাত পার্বত্য শিল্পাঞ্চলের কথা আপনারা অবগত আছেন। সেখানে সম্প্রতি একটি তৈলশোধনাগারও গড়ে তোলা হয়েছে। শ্রীমতী সোনালীর বাবা শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্যানার্জি তার ডিরেক্টর। আমার বিশেষ স্নেহভাজন বন্ধু। এবং......

সোনালী হাত তুলে হাসতে হাসতে বলল—কর্ণেল, যথেষ্ট

হয়েছে। আমরা কেউই জয়ন্তবাবুর মতো খ্যাতিমান নই। অত বলার কিছু নেই।

কর্ণেল হতাশ ভঙ্গীতে বসে পড়লেন এবং চুরুট ধরালেন। কর্ণেলের ভাষণের মধ্যেই আমরা পরস্পর নমস্কার পর্ব সেরে নিয়েছি। এবার আমিও সিগ্রেট ধরালুম। এই সময় চোখে পড়ল, ওরা মহিলাসুলভ সতর্ক ভঙ্গীতে কিছু বলাবলি করছে—সেটা চোখের ভাষাতেই, এবং তাদের লক্ষ্য যে আমি, তাতে কোন ভুল নেই। তারপর সোনালী কর্ণেলের দিকে তাকাল, ঠোঁটে চাপা কুণ্ঠিত হাসি। —কর্ণেল! জয়ন্তবাবু যদি কিছু মনে না করেন···

ধুরন্ধর বুড়ো খুশি হয়ে বলে উঠলেন—কিচ্ছু মনে করবে না ও। বাছা সোনালী, তুমি ওকে স্বচ্ছন্দে তোমার জন্মদিনের নেমন্তন্নট করতে পারো। বরং জয়ন্তের মতো একজন প্রাণবন্ত যুবক থাকলে তোমাদের অনুষ্ঠানের ষোলকলা পূর্ণ হবে।

আবার হাসির ধুম পড়ল। সোনালী তার ব্যাগ থেকে একটা সুদৃশ্য কার্ড এবং খাম বের করে সযত্নে আমার নাম লিখল। লিখে আমার কাছে এসে বিনয় দেখিয়ে বলল—হয়তো অডাসিটি হচ্ছে, তবু আপনাকে পেলে আমি—আমরা সবাই খুব খুশি হবো। প্লীজ আসতে ভুলবেন না।

একটু দ্বিধা দেখিয়ে বললুম—কিন্তু···মুশকিল কী জানেন? রিপোর্টারের চাকরি করি। কখন কোথায় কোন এ্যাসাইনমেণ্ট এসে কাঁধে চাপে বলা যায় না।

কর্ণেল প্রায় ধমক দিয়ে বলে উঠলেন—জয়ন্ত, বাজে বকোনা! রানীডিহি এবং আমার কন্যাবৎ এই মেয়ে, দুটোই মর্তের এক দুর্লভ বস্তু। সুতরাং কোনরকম বাচালতা না করে কার্ডটি পকেটস্থ করো। এবং তোমার ক্ষুদে রিপোর্টিং বহিটি বের করে তারিখটা লিখে রাখো। লেখ, ১৭ সেপ্টেম্বর, সকাল সাড়ে সাতটায় হাওড়ায় বোম্বে মেল, দশ নম্বর প্লাটফর্ম। আমার বাসায় আসার দরকার নেই।

কারণ, তাহলে তুমি ট্রেন ফেল করবেই। তারও কারণ, তুমি লেট-রাইজার।......

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে ওরা চলে গেল। তখন কর্ণেলের কাছে গিয়ে বসলুম। বললুম—হ্যালো ওল্ড ম্যান! এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কী?

—কিসের?

—এই নিছক একটি মেয়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে তিনশো কিলো-মিটার ভ্রমণের?

কর্ণেল চোখে মুগ্ধতা ফুটিয়ে বললেন—জয়ন্ত, ডার্লিং! রানীডিহির সৌন্দর্য তুলনাহীন। মর্তের স্বর্গ।

—হাতি! আমি শুনেছি, রানীডিহি শিল্পনগরী। আকাশ বাতাস কুচ্ছিত ধোঁয়া আর গ্যাসে ভরা। নরক বিশেষ।

কর্ণেল মৃদু হেসে বললেন—হ্যাঁ। কিন্তু সোনালীদের কোয়ার্টার যেখানে অবস্থিত, সেখানে গেলে পৃথিবীর যাবতীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নমুনা তুমি পাবে, বৎস। নদী, পর্বতমালা, অরণ্য...

—এবং দুর্লভ প্রজাপতি পাখি কীট পতঙ্গ!

—ডার্লিং, আমি কথা দিচ্ছি, এবার আমি প্রকৃতিবিদ্ হিসাবে রানীডিহি যাবো না। যাবো···

ওঁকে থামতে দেখে বললুম—হুঁ, বলুন।

—যাবো আমার আসল মূর্তিটি পোশাকের তলায় লুকিয়ে নিয়ে।

—তার মানে?

—প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার হিসেবেই।

চমকে উঠে বললুম—সে কী! কেন?

কর্ণেল চোখ বুজে দুলতে দুলতে বললেন—একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে জয়ন্ত। এটা না ঘটলে শ্রীমতী সোনালীর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমি অতদূরে কিছুতেই যেতুম না। স্বীকার করছি, জায়গাটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খ্যাতি আছে। কিন্তু তার চেয়েও

একটা জরুরী বিষয় সম্প্রতি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তোমাকে আগাগোড়া সবটা বলছি। ভাল করে শোন।

কর্ণেল আমাকে যা শোনালেন, তা সংক্ষেপে এই : এক সপ্তাহ আগে অর্থাৎ তেসরা সেপ্টেম্বর সোনালীর বাবা অনিরুদ্ধবাবু কর্ণেলের সঙ্গে দেখা করেন। তারও দুদিন আগে রানীডিহিতে ওঁর কোয়ার্টারে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে, তাই কর্ণেলের পরামর্শ চাইতে আসেন। সেদিন ছিল রবিবার। বেলা একটায় লাঞ্চের পর উনি অভ্যাস মতো গড়াচ্ছেন, পরিচারিকা এসে খবর দেয় যে এক ভদ্রলোক জরুরী ব্যাপারে দেখা করতে এসেছেন। অনিরুদ্ধবাবু বিরক্ত হন। এটা দেখা করার সময় নয়। তাছাড়া উনি কোয়ার্টারে অপরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা করেন না। অফিসেই যেতে বলেন। পরিচারিকা সব জানে এবং বুঝিয়ে বলা সত্ত্বেও সেই লোকটি শোনেনি। বলেছে, দেখা না করলেই চলবে না। এবং এই দেখা করার পিছনে নাকি অনিরুদ্ধবাবুরই বিশেষ স্বার্থ আছে। অনিরুদ্ধবাবু বিরক্ত হলেও কৌতূহল দমন করতে পারেন নি। তাই বলেন—ঠিক আছে, তুমি আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে বলো। এই আধঘণ্টার 'ভাতঘুম' বাঙালীর মজ্জাগত এবং অনিরুদ্ধবাবু মনে মনে ভীষণ বাঙালী। যাই হোক, পরিচারিকা গিয়ে তাকে অপেক্ষা করতে বললে সে ততক্ষণ সময় কাটানোর জন্যে একটা বই চায়। এটাই অদ্ভুত যে সে অন্য কোন বই পছন্দ করেনি। আলমারিতে 'পশ্চিম এশিয়ার অর্থনীতি' নামে প্রকাণ্ড ইংরেজি বই ছিল, সেটাই চায়। তারপর পরিচারিকা বইটি তাকে দিয়ে চলে আসে। আধঘণ্টা পরে অনিরুদ্ধবাবু ড্রয়িং রুমে যান। কিন্তু লোকটিকে দেখতে পান না। টেবিলে সেই বইটি পড়ে থাকতে দেখেন। বইটি রাখতে গিয়ে হঠাৎ লক্ষ্য করেন, একটা ভাঁজ করা কাগজ উঁকি মারছে ফাঁকে। কাগজটা খুলে পড়ার পর হতভম্ব হয়ে যান উনি। তাতে ডটপেনে ইংরেজিতে লেখা আছে : "যা বলতে এসেছিলুম, বলা হল না। ওরা আমাকে ফলো করে এসেছে

টের পেলুম। তাই চলে যাচ্ছি। আজ রাত এগারোটায় আপনি জলের ট্যাংকের পিছনে আমার সঙ্গে দেখা করুন। আমি সেখানে থাকব। আপনি কাকেও দেখা-মাত্র বলবেন—জিরো নাম্বার? সে যদি বলে—জিরো জিরো জিরো, তাহলে জানবেন সে আমিই। অন্যকিছু ঘটলে তখুনি পালিয়ে আসবেন। জিরো জিরো জিরো। ভুলবেন না।”

নামের বদলে তিনটে শূন্য বসানো। বলা বাহুল্য, অনিরুদ্ধ এই অদ্ভুত চিঠি পেয়ে খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। ভাবেন, পুলিশের কাছে যাবেন। কিন্তু শেষ অব্দি তীব্র কৌতূহল তাঁর সব মতলব দাবিয়ে রাখে। যথাসময়ে সেই জলের ট্যাংকের কাছে যান। জায়গাটা খেলার মাঠ ও বড় রাস্তার সঙ্গমে রয়েছে। কিছু ঝোপঝাড় ও পাথরও আছে। উনি গিয়ে একটা লাশ দেখতে পান। পিঠে ছুরিমারা হয়েছে। তখনও রক্ত তাজা। সুতরাং ভীষণ ভয় পেয়ে পালিয়ে আসেন।

সকালে লাশটার খবর পেয়ে পুলিশ আসে। অনিরুদ্ধ বাবু নিজেকে এ ব্যাপারে জড়াতে চান নি। লোকটাকে সনাক্ত করতে পারে নি পুলিশ। যাই হোক, অনিরুদ্ধ বাবুর মনে পড়ে যায় কর্ণেল নীলাদ্রি সরকারের কথা। পরদিনই কলকাতা এসে দেখা করেন। চিঠিটাও নিয়ে আসেন।

কর্ণেল এই সাতটা দিন কি সব করেছেন, আমাকে কোনরকম আভাস দিলেন না। শুধু বুঝলাম, হঠাৎ এই প্রখ্যাত গোয়েন্দাটি রানীডিহি হাজির হলে পুলিশমহলে ঔৎসুক্য জাগতে পারে—এবং সম্ভাব্য শত্রুপক্ষ—যারা সেই অজ্ঞাতনামা লোকটিকে খুন করেছে, তারাও সতর্ক হয়ে যায়—তাই সোনালীর জন্মদিনের অছিলা। অবশ্য, সোনালী এসব ব্যাপার জানেই না। সে তার জন্মদিনে আর সবাইকে নেমতন্ন করার জন্য কলকাতা এসে বাবার কথামতো কর্ণেলকেও নেমতন্ন করে গেল।······

কর্ণেল চুপ করলে বললুম—ব্যাপারটা রহস্যময়। আমার মনে হচ্ছে, সেইসঙ্গে বিপজ্জনকও বটে। সচরাচর আপনি যে সব ব্যাপারে নাক গলান এবং কৃতিত্ব অর্জন করেন, এটা তত সহজ মোটেও নয়। আপনার লাইফ রিস্কের কথা ভেবেছেন তো?

বুড়ো একটু হাসলেন। কিছু বললেন না।

বললুম—এসব ব্যাপারে নাক না গলানোই উত্তম, আমার মতে। সরকারী লোকেরা যা পারে, করুক। আপনি গোয়েন্দাবিদ্যায় যত ধুরন্ধরই হোন, ভুলে যাবেন না যে এই কেসে খুনী কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়, সম্ভবত একটা দল এবং এতে কোন ব্যক্তিগত অভিসন্ধি কাজ করছে না। কে বলতে পারে, কুখ্যাত মাফিয়া দলের মতো. কোন আন্তর্জাতিক গুপ্তদল এর পেছনে আছে কি না? তাদের কী উদ্দেশ্য, তাও তো আপাতত আপনার জানা নেই।

কর্ণেল টাকে হাত বুলিয়ে বললেন—তোমার পরামর্শ খুব উৎকৃষ্ট জয়ন্ত। যুক্তি আছে। তোমার অনুমানও সম্ভবত ঠিক।

উৎসাহে বললুম—আলবাৎ ঠিক। একটা ব্যাপার তো পরিষ্কার বোঝা যায়, লোকটা সেই দলেরই লোক। কোন কথা ফাঁস করে দিতে চেয়েছিল অনিরুদ্ধ বাবুকে। তা টের পেয়ে তাকে মেরে ফেলল ওরা। তাছাড়া..

কর্ণেল সায় দিয়ে বললেন—হুম! বলে যাও ডার্লিং—

—অনিরুদ্ধ বাবু কে? না—উনি এক তৈল শোধনাগারের ডিরেক্টর। দ্বিতীয় পয়েন্ট লক্ষ্য করুন: লোকটা যে বই বেছে নিয়ে চিঠি রেখেছিল, সেটা পশ্চিম এশিয়ার অর্থনীতি। এবং পশ্চিম এশিয়ার অর্থনীতি একান্ত ভাবে তৈলশিল্পকেন্দ্রিক। এই যোগাযোগ কি আপনি আকস্মিক মনে করছেন?

কর্ণেল সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—অপূর্ব জয়ন্ত! এজন্যেই সব কেসে আজকাল তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাই। ব্রিলিয়ান্ট! বলে যাও ডার্লিং!

—সবার আগে সেই বইটা আপনার পরীক্ষা করা দরকার!

—হুম্।

—অনিরুদ্ধবাবুর উচিত ছিল, রিফাইনারিতে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করা।

—কারণ?

—আমার ধারণা, ওখানে কোন অন্তর্ঘাত ঘটাবার ষড়যন্ত্র চলেছে। সে কথাটাই লোকটা বলতে এসেছিল। সুযোগ পায় নি। তাই দেখা করতে বলে ওইভাবে। এবং খুন হয়ে যায়।

—রিফাইনারিতে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা তখনই করেছেন অনিরুদ্ধবাবু।

—আমার আরও ধারণা, রিফাইনারির অফিসার ও কর্মীদের মধ্যে ওই দলের লোক আছে।

—অসম্ভব নয়, জয়ন্ত।

আমি আরও কিছু তত্ত্ব খুঁজছি, দেখি, বুড়ো উঠে দাঁড়ালেন এবং মেঝেয় কয়েক পা হেঁটে আমার দিকে হঠাৎ ঘুরে হো হো করো হেসে উঠলেন। বললুম—আমাকে তাচ্ছিল্য করতে পারেন, কিন্তু আমি বাজী রেখে বলতে পারি—একচুলও অযৌক্তিক কথা বলিনি।

কর্ণেল বললেন—তাহলে জয়ন্ত, সব রহস্য ফাঁস হয়ে গেছে বলা যায়। কিন্তু বৎস, একটা পয়েন্ট তুমি আমল দিচ্ছ না যে যদি কোন অন্তর্ঘাত সম্পর্কে অনিরুদ্ধবাবুকে কেউ সতর্কই করতে চাইত, তাহলে চিঠি বা ফোনেই জানাতে পারত! দেখা করতে আসা, ওই বিশেষ বইটা চেয়ে নেওয়া এবং......জয়ন্ত, ডার্লিং! শুধু তাই নয়, যে পাতায় চিঠিটা ছিল, তার পেজমার্ক কতো জানো? থ্রি, জিরো—মানে, তিরিশ!

—বলেন কী!

—ওই পাতায় কী আছে, তাও জেনে নিয়েছি। চ্যাপ্টারটা পুরো লেখা হয়েছে সেই সুবিখ্যাত লরেন্স সাহেবকে নিয়ে। অর্থাৎ লরেন্স

অফ অ্যারাবিয়ার কার্যকলাপ। আশা করি, লরেন্স সম্পর্কে তুমি বিশদ জানো। এমনকি সিনেমাতেও কলকাতাবাসীদের একজন হিসেবে·····

হাত তুলে বললুম—দেখেছি। আশ্চর্য ছবি!

ষোল সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ সোনালীর জন্মদিনের একদিন আগেই আমরা দুজনে রানীডিহি পৌঁছলুম। রিফাইনারি থেকে দূরে চমৎকার পাহাড়ী এলাকায় ডিরেক্টর সায়েবের বাংলো এবং অন্যান্য অফিসারদের কোয়ার্টার। ছবির মতো দেখাচ্ছিল ঘরবাড়িগুলো। প্রাকৃতিক দৃশ্যও অপূর্ব।

সবে শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠেছে। কর্ণেল ড্রয়িং রুমে গল্প করছেন। আমি দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে বসলুম। টিলার ওপর বাংলোটা। তাই জ্যোৎস্নায় নীচের উপত্যকাটা ভারি রহস্যময় দেখাচ্ছিল। বারান্দার ওপরে একটা হাল্কা আলোর বাল্ব রয়েছে। আলোটা নিবিয়ে দিলে বাইরের সৌন্দর্য পুরোপুরি ফুটত ভেবে সুইচ খুঁজছি, এমন সময় সোনালী, রত্না, দীপ্তি আর একটি অচেনা যুবক এল। সোনালী বলল—আলাপ করিয়ে দিই জয়ন্তবাবু। রত্নার দাদা দিব্যেন্দু। মানে আমারও মাসতুতো দাদা। দিবা, তোমাকে তো এঁর কথা বলেছি। জয়ন্ত চৌধুরী······

দিব্যেন্দু নমস্কার করল হাসিমুখে।—দৈনিক সত্যসেবকে আপনার রিপোর্টগুলো আমি কিন্তু মন দিয়ে পড়ি। খুব ইন্টারেস্টিং!

রত্না বলল—তার চেয়েও ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা এবার আলোচনা করা যাক্ দিব্য। সোনালী, তুই শুরু কর।

চারটি মুখে ষড়যন্ত্রসঙ্কুল হাসি দেখছিলুম। বললুম—কী ব্যাপার?

সোনালী দ্রুত এদিক ওদিক দেখে নিয়ে চাপা গলায় বলল—জয়ন্তবাবু, ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে? আপনি নিশ্চয় ওই গোয়েন্দা

ভদ্রলোকের চেলাচামুণ্ডা ?

হেসে ফেললুম।—ব্যাপার কী ? অবশ্য, আমি ওর নিছক ভ্রমণ-সঙ্গী। চেলাটেলা নই।

সোনালী ফিসফিস করে বলল—কর্ণেলকে নিয়ে আমরা একটু মজা করলে—মানে জাস্ট এ ফান—আপনার আপত্তি হবে না তো ?

—মোটেও না। বরং আমি আপনাদের দলে ঢুকে পড়ব। কিন্তু সাবধান, বুড়ো ভারি ধুরন্ধর।

রত্না বলল,—এত নাম ডাক শুনেছি। এত অদ্ভুত ব্যাপার নাকি করতে পারেন! এবার দেখা যাক্ না হাতে নাতে!

সোনালী বলল—আমরা একটা মার্ডার কেস সাজাব, বুঝলেন ?

—হ্যাঁ, বলে যান।

এই সময় ড্রয়িং রুমের দরজা থেকে একটি মুখ উঁকি মারল। চিনলুম। একটু আগেই আলাপ হয়েছে। অনিরুদ্ধের পি. এ. রণধীর চোপরা। বেশ স্মার্ট হাসিখুশি যুবক। এসে বিশুদ্ধ বাংলায় বলল—ডিসটার্ব করলুম না তো ?

সোনালী উৎসাহ দেখিয়ে বলল—ব্যস, মেঘ না চাইতেই জল। রণধীরদা, তোমাকেও দলে নিলুম তাহলে। ব্যস, আমরা মোট ছ'জন ব্যাপারটা জানলুম। এবার প্ল্যানটা বলি। আমরা একটা চমৎকার মার্ডার কেস সাজাব। কিছু ক্লু রাখব। দেখব, কর্ণেলের গোয়েন্দা বুদ্ধি কতখানি।

রত্না বিরক্ত হয়ে বলল—আহা, বলেই ফেল না বাবা। শুধু ভূমিকা করছিস!

সোনালী সিরিয়াস হয়ে চাপা গলায় বলতে শুরু করল—ওই যে গেট রয়েছে, তার বাইরে ঝোপঝাড়গুলোর মধ্যে একজায়গায় আমরা একটা ডেডবডি রাখব।

চোপরা বিস্ময়মেশানো আতঙ্কে বলল—সর্বনাশ! ডেডবডি ?

সোনালী ধমক দিয়ে বলল—ভ্যাট, কিস্যু বোঝে না! রিয়েল

ডেডবডি নয়—নকল। আমরা দীপ্তিকে ডেডবডি করব। আমাদের থিয়েটার ক্লাবের একটা টিনের ছোরা আছে। ছোরাটার ডগাটা চাপ দিলে ভেতরে ঢুকে যায় এবং বডিতে আটকে পড়ে। কেমন? দীপ্তির বুকে সেটা আটকে থাকবে।

দীপ্তি এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। এবার বলে উঠল—না, না! পিঠে!

—বেশ, পিঠেই। পিঠে আটকে দিয়ে লাল রঙ ছড়িয়ে দেব। সে আমি ম্যানেজ করব'খন। একেবারে টাটকা দলা-দলা রক্তের মতো দেখাবে। দীপ্তি মড়া সেজে পড়ে থাকবে। এবার ক্লু। ক্লু থাকবে একটা পোড়া দেশলাই কাঠি, আধপোড়া সিগ্রেট তিন চারটে...

দিব্য বলল—তাহলে আমাকে ধরে ফেলবে। আমি চেইন স্মোকার।

চোপরা বলল—আমাকেও। আমিও চেইন স্মোকার।

সোনালী বলল—তাহলে অন্য ক্লুর কথা ভাবা যাক্। জয়ন্তবাবু কী বলেন?

বললুম—কিন্তু তার আগে বলুন, আপনারা খুনী হিসেবে একজনকে নিশ্চয় ধরে রাখছেন! সে রোলটা কে নিচ্ছেন?

—দিব্য। দিব্য, তুমি রাজী তো?

দিব্যেন্দু আমতা হেসে বলল—বেশ। কিন্তু...

সোনালী বলল—কোন কিন্তু নয়। তুমিই কিলার। এবার জয়ন্তবাবু বলুন।

বললুম—ক্লু খুব সহজ হওয়া চাই। কারণ, এটাতো জাস্ট এ গেম। নিছক খেলা! কর্ণেলের যা স্বভাব, প্রথমে সত্যিকার খুন ভেবে খুব সিরিয়াস হয়ে পড়বেন এবং তক্ষুনি পুলিশ ডাকতে বলবেন। ফোরেন্সিক বিশেষজ্ঞদেরও আসতে বলবেন। এবং এ্যাম্বুল্যান্স ইত্যাদি এসে যাবে।

সোনালী ব্যস্তভাবে বলল—সর্বনাশ। তাহলে তো ওঁকে...

বাধা দিয়ে বললুম—উনি ডেডবডি দেখে তেমন কিছু করার আগেই দীপ্তি দেবী হেসে উঠবেন এবং আপনারা দৌড়ে গিয়ে তখন বলবেন, হ্যালো টিকটিকি মশাই, এবার আপনি হত্যাকারীকে বের করুন তো! দেখি, আপনি কেমন গোয়েন্দা!

সবাই হেসে উঠল। সোনালী বলল—ইউরেকা! একটা ক্লু আমার মাথায় এসেছে। নীচের দিকে নদীতে এখন ফ্লাডটা কমেছে। কিন্তু পলি জমে আছে পাড়ের জঙ্গলে। দিব্যর পায়ে জুতোর সেই কাদা লেগে থাকবে। এবং দীপ্তির ডেডবডির কাছে কিছু কাদা ফেলে রাখা হবে। যতক্ষণ খেলা চলবে, দিব্য সেই জুতোই পরে থাকবে। কেমন? জয়ন্তবাবু, কর্ণেল অত খুঁটিয়ে কি লক্ষ্য করবেন?

বললুম—কে জানে! তবে বুড়ো বড্ড সেয়ানা।

দিব্যকে নার্ভাস দেখাচ্ছিল। বলল—তাহলে সন্দেহ তো একজনের ওপরেই পড়ার মতো ক্লু রাখা হচ্ছে। এমন সব চিহ্ন রাখো, যাতে কর্ণেল প্রত্যেককেই সন্দেহ করেন।

রত্না সায় দিয়ে বলল—এই! দাদা কিন্তু ঠিকই বলেছে! রণধীরদা, তোমাকে সন্দেহ করার মতো কী চিহ্ন রাখা যায় বলো তো?

চোপরা একটু ভেবে নিয়ে বলল—আমার লাইটারটা ফেলে রাখব কোথাও। ডেডবডির কাছাকাছি। তার মানে, আমি ও দীপ্তি ধরো কথা বলছিলুম ওখানে। আমি চলে এলুম, দীপ্তি থাকল। তারপর খুন হয়ে গেল ও।

সোনালী বলল—চমৎকার। আমরা সাক্ষী দেব, মানে আমিই বলব যে দীপ্তি আর রণধীরদার ঝগড়া হচ্ছিল ওখানে। বাংলোর এই বারান্দা থেকে শুনেছি।

চোপরাকেও এবার নার্ভাস দেখাল। সে বলল—তাহলে দুজন মোটে সাসপেক্ট?

সোনালী বলল—আরেকজন হলে ভাল হত। কর্ণেলকে

গোলমালে ফেলা যেত। কিন্তু পুরুষমানুষ ছাড়া মার্ডারার হয় না। মানায়ও না!

দিব্য আপত্তি করে বলল—মোটেও না। মেয়েরাও ছোরা চালায়।

সোনালী, রত্না, দীপ্তি একসঙ্গে বলে উঠল—না, না! মোটেও না।

আমি একটু হেসে বললুম—হ্যাঁ, ছোরাটোরা মেয়েদের মার্ডার উইপন নয় সচরাচর। রিভলবার বরং চালাতে শুনেছি। তবে সেটা বিরল কেস। সচরাচর বিষই মেয়েদের মার্ডার উইপন! এক্সকিউজ মি, এ কিন্তু স্বয়ং কর্ণেলেরই সিদ্ধান্ত।

চোপরা বলল—মহিলা গোয়েন্দাকাহিনীকার অগাথা ক্রিস্টিরও এই মত।

মেয়েরা একসঙ্গে সায় দিয়ে হেসে বলল—খানিকটা কারেক্ট।

সোনালী বলল—তৃতীয় পুরুষ মানুষ অবশ্য জয়ন্তবাবু আছেন। কিন্তু...

বললুম—কর্ণেল আমাকে হিসেবে ধরবেনই না। সুতরাং আমারই খুনী হবার স্কোপ ছিল এবং আপনারা কর্ণেলকে প্রব্লাস্ত করতে পারতেন।

দিব্যেন্দু অমনি ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল—সোনালী! তোমরা বরং জয়ন্তবাবুকেই খুনী করো।

সোনালী রত্না ও দীপ্তির দিকে তাকাল। ইতিমধ্যে ওদের ফানটা আমার দারুণ ভাল লেগে গেছে। বুড়ো ঘুঘুকে নিয়ে এমন মজা করার সুযোগ কখনও পাইনি। তাই বলে উঠলুম—ঠিক আছে। আমিই খুনী হলুম। নদীর পলিতে হেঁটে আসব আমিই। আর দিব্যবাবু বরং অন্যতম সাসপেক্টেড হয়ে ওঠার জন্য অন্য কোন ক্লু রাখবেন।

দিব্যেন্দু বলল—আমি···আমি ওখানে আমার একটা বিশেষ

ব্রাণ্ডের সিগ্রেটের টুকরো ফেলে আসব। এই সিগ্রেট জয়ন্তবাবু বা রণধীর খান না। খান কি?

আমি ও চোপরা ওর ব্রাণ্ড দেখে বললুম—না।

সোনালী খুব খুশি হয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল—এবার কফি খাওয়া যাক্। এতক্ষণ তৈরি নিশ্চয়। কফি খেতে-খেতে আরো ডিটেলস আলোচনা করা যাবে।

ওকে সতর্ক করে দিয়ে বললুম—দেখবেন, কর্নেলবুড়ো যেন এদিকে না এসে পড়েন! কী অবস্থায় আছেন, দেখে আসবেন কিন্তু।

সোনালী মাথা দুলিয়ে চলে গেল। আমি দীপ্তির দিকে তাকালুম। দীপ্তি কি নার্ভাস হয়ে পড়ছে ক্রমশ? তাকে কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। হেসে বললুম—ভয় পেয়েছেন দীপ্তি?

দীপ্তির হাসিতে শুকনো ভাবটা ঢাকা গেল না। রত্না বলল—ও ভয় পাবে কী? আপনি তো জানেন না, আমাদের থিয়েটার ক্লাবের সবচেয়ে পাকা অভিনেত্রী ও। নাচতে গাইতেও পারে। কাল সোনালীর জন্মদিনে ওর কীর্তি দেখে আপনার তাক লেগে যাবে।

দীপ্তি যেন বিরক্ত হল। বলল—বাজে বকিসনে, রত্না। জয়ন্ত-বাবু কলকাতায় থাকেন, ভুলে যাস্ নে। আদাড় গাঁয়ে শেয়াল রাজা আমি।

কথা কেড়ে রত্না বলল রাণী বল, দীপ্তি।

সবাই হাসল। চোপরা বলল—কাল ফাংশানের প্রোগ্রাম কি এখনও আমায় জানানো হয় নি কিন্তু। একেবারে লাস্ট মোমেন্টে বলবে, তখন ম্যানেজ করতে পারব না বলে দিচ্ছি। প্রোগ্রাম ডিরেক্টর নিশ্চয় রত্না?

রত্নাকে একটু বিরস দেখাল। বলল—বেশি কিছু করা যাবে না। মেশোমশাই বলেছেন—খুব ধুমধাম করা হবে না। বেশি কেউ আসছেনও না। লোকাল লোক আর বাইরের মিলে বড় জোর জনা দশ বারো। অবশ্য ড্রইংরুমটা বড়ো। স্টেজ হবে না। দীপ্তিই

নাচবে-গাইবে!

দীপ্তি বলল—এবং তুমিও।

রত্না কী বলতে যাচ্ছিল, সোনালী ও একজন পরিচারিকা ট্রে নিয়ে এল। সোনালী ফিসফিস করে বলল—কর্ণেল গম্ভীর মুখে কী একটা প্রকাণ্ড বই পড়ছেন। বাবা পাশে তেমনি গম্ভীর মুখে বসে আছেন। কিন্তু মুশকিল হয়ে গেছে। মা জানতে পেরেছেন সব। বারণ করেছিলেন। আমার ভয় করছে– বাবার কানে না তোলেন!

রত্না বলল—এই রে! সেরেছে! মাসিমাকে জানাল কে?

দিব্য বলল—আমি তো কিছু বলিনি। নিশ্চয় দীপ্তি বলেছে!

কাঁচুমাচু হয়ে দীপ্তি বলল—মানে, ওঘরে যখন সোনালী আর রত্নার সঙ্গে এনিয়ে আলোচনা করছিলুম, মাসিমাব কানে গিয়েছিল। আমি বেরোলে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—মার্ডার-টার্ডার কী সব বলছি? উনি যা মানুষ, হইচই করে ফেলবেন—এই ভয়ে বলতে হল। উনি আমাকে নিষেধ করছিলেন।

চোপরা কফিতে চুমুক দিয়ে বলল—তাহলে দি গেম ইজ ফিনিশ। উনি বাধা দেবেন। আই নো ইট।

সোনালী একটু ভেবে বলল—এক কাজ করা যাক। টাইমটা বদলে সকাল নটার বদলে ভোর ছটা। অত সকালে মায়ের ঘুম ভাঙবে না। রণধীরদা, তুমি কিন্তু ভোর পাঁচটায় আসছ। দিব্য, রত্না, দীপ্তি—সবাই ঠিক ওই সময়ে। জয়ন্তবাবু, আপনার ঘুম ভাঙবে তো?

বললুম—হ্যাঁ। তবে কর্ণেলেরও ভাঙবে। এবং উনি অভ্যাসমত বেড়াতে বেরোবেন।

সোনালী বলল—বাঃ! তাহলে তো চমৎকার সুযোগ। উনি ফিরলেই আমরা ঝটপট দীপ্তিকে ওখানে রেখে চলে আসব। খবর দেবে—এই রে! মার্ডারটা কার প্রথম চোখে পড়বে ঠিক করা হয়নি যে!

রত্না বলল—দাদাই দিক্ না। দাদাও ধর মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছিল। ফিরে এসে চোখে পড়েছে। ব্যস।

দিব্য বলল—বেশ। কিন্তু মোটিভ কী রাখছ খুনের? বলে সে দীপ্তির দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে থাকল।

রত্না মুখ টিপে হেসে বলল—মোটিভ ইজ প্রেমের প্রতিহিংসা? দাদা চোপরা এবং জয়ন্তবাবু তিনজন প্রেমিক, একজন প্রেমিকা।

দীপ্তি হইচই করে বলল—যাঃ! তার মুখ রাঙা দেখাচ্ছিল।

বললুম—এতে সংকোচের কী আছে মিস দীপ্তি? জাস্ট এ গেম। অভিনয়। আপনি নিশ্চয় প্রেমিকার ভূমিকায় থিয়েটারে অভিনয় করেছেন।

সোনালী বলল—একশোটা করেছে। তুলনাহীন অভিনয়।

দীপ্তি হঠাৎ ঘুরে বলল—আচ্ছা, ধরুন যদি এমন হয়—মানে, আপনারা তিনজনের একজন কোন গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এবং আমি সেটা টের পেয়েছিলুম বলেই আমাকে…মানে…

চোপরা হো হো করে হেসে বলল—চমৎকার! কিন্তু ষড়যন্ত্র কিসের?

—ধরুন, এখানে অয়েল রিফাইনারিতে কোন স্যাবোটাজ করার জন্য….

দিব্য বাধা দিল—এক মিনিট। ব্যাপারটা খুব জটিল আর কষ্ট-কল্পিত।

যেন জেদ ধরল।—কেন? এমন হচ্ছে না আজকাল? সরকারী প্রজেক্টে বিদেশী এজেন্টের লোকেরা অন্তর্ঘাত করার চেষ্টা করেছে না?

চোপরা বলল—ব্রিলিয়ান্ট! খুব স্বাভাবিক মোটিভ। কিন্তু তার তো ক্লু থাকা চাই।

দীপ্তি বলল—ধরুন, আমার কাছে কোন টুকরো কাগজ থাকবে এবং তাতে কোন সাংকেতিক কিছু লেখা থাকবে। ভাববেন না, সে

আমি নিজেই ম্যানেজ করব'খন। কাগজটা ছেঁড়া হবে এবং আমার মুঠোর মধ্যে লুকানো থাকবে।·· ···

সোনালী হাসতে হাসতে বলল—বুঝেছি। দীপ্তি এই তিনজনের প্রেমিকা হতে চায় না! পছন্দ হচ্ছে না। তাই বাপ্‌স! অয়েল রিফাইনারিতে স্যাবোটাজ! বাবাকেও জড়াচ্ছে! তবে এই মোটিভটা খুব সিরিয়াস। গেমটা আরও জমবে। কর্ণেলের বুদ্ধি গুলিয়ে যাক্ না!

আমি কিন্তু চমকে উঠেছিলুম। দীপ্তির মুখে কী একটা টের পাচ্ছিলুম। সেটা ঠিক কী, বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। একটা দৃঢ়তাই কি দেখলুম? অস্বস্তি হল। সেই মুহূর্তে কর্ণেলকে দেখা গেল দরজায়। আমরা তাকালুম। কিন্তু বুড়ো ফের ঘরে ঢুকে গেলেন। সোনালী চাপা হেসে সন্দিগ্ধ মুখে বলল—শুনলেন না তো কিছু?

সে-রাত শুতে গিয়ে দেখি কর্ণেল বেজায় গম্ভীর। আমি শুয়ে পড়লুম। উনি টেবিল ল্যাম্পের সামনে বসে একটা প্রকাণ্ড বই পড়তে থাকলেন। বললুম—ব্যাপার কী? সারাদিন ট্রেনজার্নির পর ওই বুড়ো হাড়ের ভেল্কি দেখানো কেন? আলোয় আমার ঘুম আসে না।

কর্ণেল বইয়ের পাতায় চোখ রেখেই বললেন—এক মিনিট, জয়ন্ত। লরেন্স অফ এ্যারাবিয়ার চ্যাপটারটার আর এক প্যারা বাকি। তুমি প্লীজ একটুখানি ধৈর্য ধরো। লাভবান হবে।

—আমার কিসের লাভ?

—থ্রি জিরোর তত্ত্ব আঁচ করেছি ডার্লিং! দৈনিক সত্যসেবক-এ এটা ছাপা হলে কাগজের বিক্রি বাড়বে এবং তোমারও বেতনের ইনক্রিমেন্ট হবে। লাভটা তো তোমারই।

অতএব ধৈর্য ধরলুম। কিন্তু সকাল-সকাল ঘুমিয়ে না পড়লে ভোর পাঁচটায় ওঠা কঠিন হবে। মনে মনে হাসলুম। বুড়োকে নিয়ে

সোনালীরা যা মজা করতে যাচ্ছে, উনি তো টেরও পাচ্ছেন না। মার্ডার গেমটা যে নিছক ফান, তা টের পাবার মুহূর্ত অব্দি উনি ওই থ্রি জিরোর তত্ত্বের সঙ্গে দীপ্তির এই অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড জড়িয়ে কী না নাজেহাল হবেন! মাথায় একটা মতলব গজাল। দীপ্তি কর্ণেল যাওয়ামাত্র যেন হেসে ধরা না দেয়। অন্তত আধঘণ্টা বুড়ো ঘুঘুকে নাজেহাল করা যাবে। তারপর ফাঁস করা হবে যে ব্যাপারটা ফার্স। ভোরে এই প্রস্তাবটা ওদের দেব।...

চোখ খুলতেই দেখি আমার বৃদ্ধ বন্ধুটি কখন নিঃশব্দে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং আমাকে দেখছেন। বললেন—তুমি চোখ বুজে হাসতে অভ্যস্ত, তা তো জানতুম না ডার্লিং! নিশ্চয় তেমন কিছু ব্যাপার ঘটেছে। আর শোন, তোমার ওই হাসিটুকুর মধ্যে দুষ্টু ছেলের আদল লক্ষ্য করছিলুম। নিশ্চয় কোন মতলব ভাঁজছিলে।

গম্ভীর হয়ে বললুম—ভাঁজছিলুম। আপনি তো গোয়েন্দা—নাকি মনের চিন্তার আভাস মুখেও বুঝতে পারেন। আপনিই বলুন, কী মতলব ভাঁজছিলুম?

কর্ণেল আমার পাশেই খাটে পা ঝুলিয়ে বসলেন। তারপর বললেন—হুম জয়ন্ত, আমি অন্তর্যামী নই। তবে এটুকু টের পাচ্ছি যে তোমরা কজন যুবক যুবতী মিলে একটা কিছু ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। যাক্ গে—এবার শোন থ্রি জিরোর ব্যাপারটা। 'পশ্চিম এশিয়ার অর্থনীতি' বইটার তিরিশ পাতায় লরেন্সের কাহিনী আছে। খুব মন দিয়ে পড়ছিলুম আর মনে হচ্ছিল, সত্যি—বড্ড বিচিত্র মানুষ ওই লরেন্স! কী বিপুল ইচ্ছাশক্তি! কী সাহস আর ধৈর্য! পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতাও কী অসাধারণ! ওঃ!

ওঁর যেন ভাবাবেগের ঘোর লেগে গেল। চোখ বুজে যেভাবে মাথা নাড়া দিলেন বারকতক, মনে হল রোমাঞ্চ সামলাচ্ছেন। অবাক হয়ে বললুম—ব্যাপারটা কী? হঠাৎ লরেন্সকে নিয়ে এত উচ্ছ্বাস কেন?

কর্ণেল চোখ খুলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—তুমি জানো না জয়ন্ত! একটা প্রচণ্ড প্রাণশক্তি না থাকলে তুরস্ক সরকারের অস্ত্রশস্ত্র আর রসদবাহী মালগাড়ির ওপর মাত্র জনাকতক বেদুইন গ্যাংস্টার নিয়ে হামলা করা যায় না। বোঝ ব্যাপারখানা! মালগাড়িতে সশস্ত্র সেনারাও ছিল। তাদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে লরেন্স নিতান্ত প্রিমিটিভ অস্ত্র নিয়ে লড়লেন! এবং…

বাধা দিয়ে বললুম—শুনেছি, মানে ছবিতে দেখেছি—আগে থেকে ডিনামাইট পোঁতা হয়েছিল লাইনের তলায়। যাই বলুন, এটা নিছক সাবোটাজ! এমন অন্তর্ঘাতমূলক কাজ যে কোন বাচ্চাই করতে পারে। লরেন্সের মহিমাটা টের পাচ্ছি না।

কর্ণেল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—পাচ্ছ না বুঝি?

—নাঃ।

কর্ণেল হঠাৎ হাসলেন একটু। তারপর মাথা নেড়ে বললেন—হ্যাঁ, তা ঠিক। সাবোটাজ করতে খুব একটা বীরত্ব লাগে না! রাইট, রাইট! সাবোটাজ!..

কর্ণেল বারবার সাবোটাজ শব্দটা আওড়াতে-আওড়াতে ফের টেবিলে গিয়ে বসলেন। বইটা খুললেন। তখন বিরক্ত হয়ে বললুম—আবার পড়তে বসলেন নাকি?

কর্ণেল বইটা খুলে কী দেখে নিয়েই বন্ধ করলেন এবং টেবিল-বাতির সুইচ অফ করে বললেন—জয়ন্ত, আশা করি এবার তোমার সুনিদ্রা হবে।

ওঁর ছোট টর্চটা জ্বলতে জ্বলতে কোণের অন্য বিছানার দিকে এগোল। একটা চাপা শব্দ হল অন্ধকারে। বুঝলুম, উনি শুয়ে পড়লেন। এবং কয়েক মিনিট পরেই ওঁর নাক ডাকা শুরু হল। কী অদ্ভুত মানুষ!……

অচেনা জায়গায় আমায় ঘুম হয় না। তাতে ভোরে ওঠার তাগিদ ছিল। রাতটা প্রায় জেগেই কাটালুম। পাশের ড্রইং রুমের দেয়াল-ঘড়ির ঘণ্টা প্রত্যেকবারই শুনেছি। যখন তিনবার বাজল, তখন টের পেলুম ঘুমের টান আসছে। অমনি সিগ্রেট ধরালুম। কর্ণেলের নাক ডাকা মাঝেমাঝে বন্ধ হচ্ছে। অস্ফুট কী যেন বলছেন—হয়তো ঘুমের ঘোরে। আবার নাক ডাকছে। সিগ্রেট খাওয়ায় কাজ হল। ঘুম আর এলও না। চারটেয় আমি উঠে পড়লুম। বাথরুমে ঘুরে এলুম। তারপর ঘুমের ভান করে পড়ে রইলুম। পাঁচটায় কর্ণেল উঠলেন। বাথরুমে গেলেন। তারপর যথারীতি টুপি ও ছড়ি নিয়ে বেরোলেন। দরজাটা আস্তে বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিলেন। ঘুঘু বুড়োকে খুব ঠকাচ্ছি ভেবে আমার মনটা খুশি।

পাঁচটায় বাইরের (দক্ষিণে) সেই বারান্দায় পায়ের শব্দ পেলুম। কোথায় গাড়ির আওয়াজ হল। বেরিয়ে দেখি, সোনালী রত্না দিব্য তৈরি হয়ে আমার অপেক্ষা করছে। বারান্দায় কফি খেতে খেতে চোপরা এল। কথামতো সে দীপ্তির বাসা থেকে দীপ্তিকে সঙ্গে এনেছে। কফি খাওয়া শেষ হলে সোনালী বলল—জয়ন্তবাবু! কুইক! চলুন, আমরা সাইট সিলেকশনটা করে ফেলি।

সোনালী একটা ব্যাগে থিয়েটারের ছোরা আর পেন্টের সরঞ্জাম নিয়েছে। আমরা তক্ষুণি গেট পেরিয়ে ছোট একটা রাস্তায় গেলুম। তার ওধারে ঘন গাছপালা ঝোপঝাড় ঢালু হয়ে নীচের উপত্যকায় নেমে গেছে। রাস্তা থেকে আন্দাজ পনের ফুট দূরে ঝোপের মধ্যে একটা বড় পাথর পাওয়া গেল। গাছপালা ঘাস এবং পাথরটা শিশিরে চবচবে হয়ে আছে। আমি ভেবেই পেলুম না, কীভাবে দীপ্তি মড়া হয়ে এখানে শোবে। দীপ্তির দিকে তাকালুম। এখন দেখি, সে যেন মরীয়া। তার মুখেচোখে দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ পাচ্ছে। সে বসে পড়ল এবং সোনালী তার পিঠে ছুরিটা সেট করতে থাকল। দিব্য বলল—জয়ন্তবাবু! আপনি সোজা এই রাস্তা দিয়ে এগোলে ঘুরতে ঘুরতে

নদীর ধারে পড়বেন। সেখান থেকে পলি এনে ছড়িয়ে বাংলোয় যাবেন নিজের ঘরে। রণধীর, তুমি বরং পূর্বে এগিয়ে ওই বড় রাস্তায় যাও। আমি যাচ্ছি পশ্চিমে বড় রাস্তায় ঘুরতে। সোনালী আর রত্না যাবে বারান্দায়। সবাই বাংলোয় ফিরে আধঘণ্টা অপেক্ষা করবে। তারপর এখানে আসবে একেবারে কর্ণেলকে নিয়েই।

দীপ্তি ওই অবস্থায় বসে খুঁতখুঁতে গলায় বলল—এতক্ষণ পড়ে থাকতে হবে এই ঠাণ্ডায়?

সোনালী ধমক দিয়ে বলল—প্রোপোজালটা কিন্তু তোমারই। ভুলে যেও না।

দীপ্তি করুণ মুখে ফের বলল—যদি কর্ণেলের ফিরতে অনেক দেরী হয়ে যায়!

আমি বললুম—হবে না। ঠিক ছটায় আজকাল উনি যোগাসন করেন।

দিব্য বলল—উনি তো খ্রীস্টান!

বললুম—জন্মসূত্রে এবং অভ্যাসে খ্রীস্টান। রক্তে হিন্দু।

সোনালী কাজ করতে করতে বলল—কুইক! দেরী হয়ে যাচ্ছে। পাঁচটা পঁয়ত্রিশ হয়ে গেল।

দিব্য ও চোপরা পরস্পর উল্টোদিকে চলে গেল। আমি পা বাড়িয়ে একবার ঘুরে দেখে নিলুম—দীপ্তির পিঠে ছোরাটা অদ্ভুত কৌশলে বসানো হয়েছে এবং সোনালী অশেষ যত্নে টকটকে লাল রঙ মেশাচ্ছে—অবিকল টাটকা রক্ত যেন! আমার গা শিউরে উঠল। কী ভয়ঙ্কর দৃশ্যই না দেখাচ্ছে!...

ছোট্ট রাস্তাটা একটু পূবে এগিয়ে বড় রাস্তার গা ঘেঁসে দক্ষিণে ঘুরেছে এবং নীচের দিকে নেমেছে। বিস্তৃত সবুজ উপত্যকা ও ভরা নদী চোখে পড়ল বাঁক থেকে। ভোরের ধূসর আলো কুয়াশার ফলে নীল রঙ ছড়াচ্ছে। একটু শীত লাগছিল। কিন্তু চারপাশে পাখির ডাক, এই সবুজ সুন্দর বনভূমি নেশা ধরিয়ে দিচ্ছিল।

হাঁটছিলুম বেশ জোরে। কারণ খুব শিগগির ঘুরে আসতে হবে। জুতোর তলায় পলি নিয়ে সেই পলি ছড়িয়ে আসতে হবে অকুস্থলে। তারপর যেন কিছু জানিনে এইভাবে নিজের ঘরে বসে কর্ণেলের অপেক্ষা করতে হবে। প্ল্যানটা নির্ভর করছে প্রত্যেকের সময় জ্ঞান এবং দক্ষ অভিনয়ের ওপর।

দশ মিনিটের মধ্যেই নদীর ধারে পৌঁছলুম। পাহাড়ী নদী। স্রোত বইছে প্রচণ্ড। পাড়ে যেখানে পলি জমেছে, সেখানে বার কতক হাঁটলুম। যখন জুতোর রবারের শোলে যথেষ্ট পলি জমল, তখন ফেরা শুরু হল।

ওঠার সময় হঠাৎ বাঁদিকে দূরে একটা টিলা থেকে কর্ণেলকে নেমে আসতে দেখে থমকে দাঁড়ালুম। কর্ণেল নীচে অদৃশ্য হলেই হুঁশ হল যে সময় চলে যাচ্ছে। বেশ জোরে হাঁটা শুরু করলুম।

অকুস্থলে পৌঁছে একটু অস্বস্তি হল। কিন্তু এ সবই তো নিছক ফান ভেবে হাসতে হাসতে জুতোর তলা থেকে খানিকটা পলি ছড়িয়ে দিলুম। তারপর ঝোপের ফাঁকে উঁকি মেরে পাথরটার কাছে দীপ্তিকে দেখতে পেলুম। দৃশ্যটা মারাত্মক। তাই ফের অস্বস্তি জাগল। দীপ্তি কাত হয়ে পাথরে হেলান দেওয়ার মতো মাটিতে বসেছে—মাটিতে ঘাস নেই। ওর শাড়িটা পাথরে ও মাটিতে এমন কায়দায় রাখা যে ওকে শিশিরের ঠাণ্ডাটা পেতে হচ্ছে না। পিঠে বাঁদিকে ছোরার বাঁট এবং অবিকল রক্ত চবচব করছে! দীপ্তি চোখ বুজে মুখ নামিয়ে পাথরে মাথাটা ঠেকিয়ে রেখেছে। ফিসফিস করে ডেকেছি—হঠাৎ শিসের শব্দ হল। ঘুরে দেখি, রাস্তা থেকে সোনালী হাত নাড়ছে। কিছু পলিমাটি দীপ্তির কাছে ছড়িয়ে তক্ষুণি ওর কাছে গেলুম। সোনালী বলে উঠল—কুইক! কর্ণেল ফিরছেন—ওই দেখুন!

পশ্চিমে বাংলোর গেট। ফুল গাছের আড়ালে ওঁর টুপি চোখে পড়ল। আমরা দুজনে গেট দিয়ে প্রায় দৌড়ে বারান্দায় উঠলুম। দিব্য ও চোপরাকে বসে থাকতে দেখলুম। রত্না মুখে তুষ্টু-তুষ্টু ভাব

ফুটিয়ে বসে আছে।

সোনালী বলল—জয়ন্ত বাবু! আপনি আর ঘরে যাবেন না! এখানে থাকুন। প্রথমে আমিই কিন্তু হইচই জুড়ে দেব। রেডি! পাঁচ গোনার পর গেম শুরু হবে। রেডি! ওয়ান…টু…থ্রি…ফোর…

পাঁচ বলার সঙ্গে সঙ্গে দিব্যেন্দুই উঠল এবং বিকট ভঙ্গী করে চেঁচিয়ে উঠল—খুন! খুন! একই মুহূর্তে আমার চোখ গেল সোনালীর দিকে। সোনালী যেন হতভম্ব হয়ে পড়েছে—কারণ এখানে তার ভূমিকাই প্রথম এবং মূল ছিল। অবাক আমিও। দিব্যেন্দুর মতো ভব্য ছেলে এই সুন্দর শারদীয় ভোরবেলাটাই যেন খুন করে ফেলল!

তারপর সোনালী একঝিলিক হেসেছে এবং ভুরু কুঁচকে দিব্যেন্দুকে যেন ধমকই দিয়েছে। দৌড়ে গেছে কর্ণেলের উদ্দেশে। দিব্যেন্দু সমানে চেঁচাচ্ছে—খুন! খুন! এবং চোপরাও গলা মেলাল। বন্থা হাসি চাপছে দেখলুম। দিব্যেন্দু আমার দিকে হাত নেড়ে তার সঙ্গে গলা মেশাতে ইশারা দিল। আমি ঘাবড়ে গেছি।

মাত্র কয়েকটি সেকেণ্ডে এসব ঘটল।

বাবুর্চি-চাকর-দারোয়ান-মালী-পরিচারিকাপ্রমুখ ভৃত্যগোষ্ঠী যেন দু-পাশের উয়িংগস থেকে স্টেজে প্রবেশ করল। তারপর রাতের গাউনপরা এবং আরক্ত চোখ নিয়ে স্বয়ং অনিরুদ্ধ বেরিয়ে এলেন।

এও কয়েক সেকেণ্ডের ঘটনা।

তারপর কর্ণেলকে বেরুতে দেখলুম। তার পাশে সোনালী হাতমুখ নেড়ে কী বলতে বলতে এগোচ্ছে। কর্ণেলের ভঙ্গীতে প্রচণ্ড ব্যস্ততা। বুড়ো সত্যিসত্যি খুনের গন্ধ পেয়ে যেন শকুনের মতো ওঁর স্বভাবসিদ্ধ রীতিতে এগিয়ে আসছেন। সোনালী অদ্ভুত অভিনয় করছে বলা যায়। সে হাত তুলে গেটের ওদিকটা দেখিয়ে ভয়ার্ত স্বরে চেঁচাল—ওদিকে! ওখানে—ওখানে!

অনিরুদ্ধের মুখেও ভীষণ আতঙ্কের ছাপ। ঠোঁট কাঁপছে দেখলুম।

বাকশক্তি রহিত।

এর পর সোনালী ও কর্ণেলের পিছন-পিছন আমরা লন পেরিয়ে গেট দিয়ে ছোট রাস্তায় পড়লুম। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখে নিলুম— বারান্দায় রত্না রয়ে গেছে এবং অনিরুদ্ধকে কিছু বলছে। দ্বিতীয়বার ঘুরে দেখলুম, অনিরুদ্ধ ঘরে ঢুকছেন—অর্থাৎ মজাটা জেনে গেছেন। রত্না দৌড়ে আসছে।

ঝোপ ঠেলে পাথরটার সামনে কর্ণেল দাঁড়ালেন এবং দীপ্তিকে ওই অবস্থায় দেখে অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন—জেসাস! তারপর অভ্যাস মতো দ্রুত বুকে ক্রস আঁকলেন।

ওঁর পিছনে দাঁড়িয়ে চোপরা এবার নিঃশব্দে হাসতে থাকল। দিব্যেন্দু ভুরু কুঁচকে ওকে ধমকাল বটে, নিঃশব্দে চুপিচুপি নিজেও হাসতে শুরু করল। সোনালী কান্নার গলায় বার বার বলতে থাকল— বেঁচে আছে তো কর্ণেল? দীপ্তিকে কে খুন করল?

সত্যি, বড় চমৎকার অভিনয় করতে পারে মেয়েটি।

হঠাৎ কর্ণেল ঘুরে আমাদের সবাইকে যেন একবার দেখে নিলেন। তারপর পা বাড়িয়ে দীপ্তির কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়লেন। আমরা সবাই চুপ। মজার চরম মুহূর্ত উপস্থিত।

কর্ণেল যেই দীপ্তির একটা হাত তুলে নাড়ি পরীক্ষা করতে গেছেন, অমনি রত্না আর নিজেকে সামলাতে পারল না। সব নিষেধ ভুলে খিলখিল করে হেসে উঠল। সোনালীও নিঃশব্দ ধমক দিতে গিয়ে তাল হারাল। এবং সেও হেসে ফেলল। দেখাদেখি আমিও হো হো করে হেসে উঠলুম। দিব্যেন্দু আমার পাঁজরে চিমটি কাটল। চোপরা একটু পিছনে দাঁড়িয়ে হাসছে। ভৃত্যগোষ্ঠী আমাদের হাসি দেখে প্রথমে হতবাক, স্তম্ভিত—পরে মজাটা টের পেয়ে গেছে। তাদেরও দাঁতগুলো ভোরের লালচে আলোয় ঝকমক করতে দেখলুম।

রত্নার হাসি শুনেই কর্ণেল ঘুরেছিলেন। কিন্তু ওঁর মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। উনি সিরিয়াস হয়েই নাড়ি পরখ করছেন।

এবং ওঁর চোখে সেই সুপরিচিত তীক্ষ্ণতা লক্ষ্য করে আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলুম।

সোনালী হাসতে হাসতে বলে উঠল--দীপ্তি! দ গেম ইজ ফিনিশড! উঠে পড়!

কর্ণেল উঠে দাঁড়ালেন। রত্না হাসতে হাসতে বলল—কর্ণেল! এবার কিন্তু মার্ডারারকে আপনার খুঁজে বের করা চাই। অনেক ক্লু আছে!

সোনালী দীপ্তির দিকে এগিয়ে ধমকের সুরে বলল--আঃ! ওঠ্ না! এই দীপ্তি! ওঠ!

কর্ণেল গম্ভীর মুখে বলে উঠলেন—দীপ্তি উঠবে না।

সোনালী বললে—উঠবে না মানে?

—ওর ওঠার ক্ষমতা আর নেই।...বলে কর্ণেল আমার দিকে দ্রুত ঘুরলেন। —জয়ন্ত, শিগগির যাও। অনিরুদ্ধ বাবুকে খবর দাও। এবং ফোনে থানায় জানাতে বলো—

বাধা দিয়ে দিব্যেন্দু বলল—কিন্তু স্যার, পুলিশ এলে প্ল্যানটা মাঠে মারা যাবে!

কর্ণেল হঠাৎ গর্জন করে উঠলেন—নো, নো মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড! দিস ইজ নো ফান। এটা সত্যিকার খুন। দীপ্তিকে কেউ সত্যিকার ছোরা দিয়ে খুন করেছে!

দিব্যেন্দু, রত্না ও চোপরা একসঙ্গে বলে উঠল—অসম্ভব! আমিও বলে উঠলুম—কর্ণেল! কী বলছেন! এ তো নিছক মজা করার জন্যে ··

কর্ণেল ফের গর্জে উঠলেন—শাট্ আপ! যা বললুম, করো গিয়ে। কুইক!

আমি যন্ত্রের মতো পা বাড়ালুম। পিছনে স্তব্ধতা। এতক্ষণে টের পেয়েছি, কর্ণেল সত্যি রসিকতা করছেন না। এবং দীপ্তি সত্যিসত্যি খুন হয়ে গেছে। আমার পা কাঁপতে লাগল। মাথা ঘুরে পড়ে যেতে

যেতে টাল সামলালুম।

বারান্দায় উঠে এবার পিছু ফিরে দেখি, দলটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।...

কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের সঙ্গে থেকে অনেক হত্যাকাণ্ড দেখেছি আমি এযাবৎ। কিন্তু এটি সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং অদ্ভুত। পনের মিনিটের মধ্যে রানীডিহির পুলিশ এসে গিয়েছিল। এখানে একটা অয়েল রিফাইনারি থাকায় কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর লোকজনও ছিল। আর ছিল রাজ্যের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের কুশলী অফিসারগোষ্ঠী। পরবর্তী আধঘণ্টায় তাঁরা সবাই এসে পড়লেন। কর্নেল এই হত্যাকাণ্ডকে সাধারণ খুন বলে গণ্য করেন নি, তা বোঝা যাচ্ছিল।

যেখানে মানুষ খুন হয়, সেখানে অফিসাররা কী পদ্ধতিতে রুটিন তদন্ত করেন—আমার দেখা আছে। এখানে তার ব্যতিক্রম ঘটল না। নীচের উপত্যকাটাও একদল অফিসার ঘুরে দেখলেন। অকুস্থলের তদন্তে যা দেখা গেল তা অদ্ভুত। সোনালী থিয়েটার ক্লাবের যে ছোরাটা দীপ্তির পিঠে আটকে দিয়েছিল, তা পাওয়া গেল দীপ্তির বুকের তলায়। সেই লাল রঙ আর সত্যিকার রক্ত একাকার হয়ে গেছে। সত্যিকার ছোরাটার বাঁটের গড়ন দেখেই অবাক হতে হয়—একেবারে হুবহু নকল ছোরাটার মতন। নকল ছোরাটা ছিল ফলার দু ভাগ করা—ভেতরে ফাঁপা এবং স্প্রিং আছে। ডগাটা একেবারে ভোঁতা—ভিজে মাটিতেও ঢোকানো যায় না। বাঁট ধরে কোথাও রেখে চাপ দিলে ডগাটা ভেতরে ঢুকে যায় এবং ভাগকরা জায়গা থেকে একটা ক্লিপ বেরিয়ে শরীরে আটকে যায়। তখন দেখে মনে হয়, আধখানা শরীরে ঢুকে গেছে। ভেতরে স্পঞ্জে রং থাকে। স্পঞ্জে চাপ পড়ামাত্র ছিটকে রঙটা বেরিয়ে আসে। থিয়েটারের খুনখারাপিতে ভারি চমৎকার কাজ দেয়। এক্ষেত্রে খুনী ওটা দীপ্তির পিঠ থেকে খুলেছে। খোলার পর আসল ছোরাটা মেরেছে এবং নকলটা বুকের

তলায় লুকিয়ে রেখেছে।

কর্ণেলের সঙ্গে ডিটেকটিভ অফিসার কিষাণ সিংয়ের কথাবার্তা আমি শুনেছি। দুজনেই একমত যে খুনী আমাদের দলেরই কেউ। দীপ্তিকে ফেলে রেখে সবে যাওয়ার পর সে ওর কাছে ফের যায় এবং সম্ভবত বলে যে ছোরাটা খুলে যাবে মনে হচ্ছে। তাই ওটা ভালভাবে আটকানো দরকার। এই অছিলায় সে হত্যার কাজটি সেরে ফেলেছে। কর্ণেলের মতে—খুবই যুক্তিসিদ্ধ কথা। অপরিচিত লোক হলে অমনটা সম্ভব হত না।

আমরা ক্লু দেখেছিলুম, পলিমাটি, দিব্যেন্দুর বাগানের সিগ্রেটের টুকরো এবং চোপরার লাইটার। এসবই আছে। কিন্তু সবটা শোনার পর ডিটেকটিভ অফিসাররা এসব আর আমল দেন নি। শুধু প্যাঁচাল বুড়ো কর্ণেল সেগুলো সযত্নে কাগজে মুড়ে পকেটে রেখেছেন। ও দিয়ে কী হবে কে জানে।

অকুস্থল থেকে ফিরে ব্যানার্জি সায়েবের বাংলোয় আমাদের ডাকা হল। দীপ্তির মা বাবা কেউ নেই—আমার কাছে মানুষ হচ্ছিল। মামা ভবেশ চক্রবর্তী রিফাইনারির অফিসের হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট। দীপ্তির মামা মামী সবাই এসেছেন। ওঁরা শোকে ভেঙে পড়েছেন। সোনালীর মা সোনালী ও বত্নাকে ক্রমাগত ভর্ৎসনা করে যাচ্ছেন। অনিরুদ্ধ স্তম্ভিত। খুব ভয় পেয়েছেন মনে হল। সোনালীর জন্মদিনের আনন্দটাও মাঠে মারা গেল।

ড্রয়িং রুমে কর্ণেল ও একদঙ্গল অফিসার বসার পর প্রথমে ডাক পড়ল আমার। স্মার্ট হয়ে ঢোকার চেষ্টা করলুম। কিন্তু বুক কাঁপছিল। চেয়ারে বসার পর প্রশ্ন শুরু হল। কর্ণেল চুপচাপ চুরুট টানছেন।

আমার নাম-ধাম, কর্ণেলের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি শেষ হল। তারপর গত রাতের ঘটনা নিয়ে জেরা চলল। আমি যা যা জানি, জবাব দিয়ে গেলুম। ওঁরা নোট করে নিলেন। তারপর কর্ণেলের কাশির শব্দ হল।—এক মিনিট। উইথ ইওর কাইণ্ড পারমিশান প্লিজ।

কিষাণ সিং বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন কর্ণেল।

—আমি জয়ন্তকে কিছু প্রশ্ন করব।

—অবশ্যই করবেন।

—জয়ন্ত! তাহলে তুমি বলছ যে সোনালীর মুখেই তুমি শুনেছ মার্ডার ফানের প্রস্তাবটা দীপ্তিই তুলেছিল?

বললুম—হ্যাঁ।

—তুমি বলছ যে গত রাতে দীপ্তির মুখে খুব নার্ভাসনেস দেখেছিলে!

—হ্যাঁ।

—এবং আজ ভোরে তার উল্টো অর্থাৎ মরীয়া মনে হচ্ছিল ওকে?

—হ্যাঁ।

—দীপ্তিই তাহলে মার্ডার ফানের মোটিভ হিসেবে···

বিরক্ত হয়ে বললুম—বলেছি তো! রিফাইনারির সাবোটাজের কথা বলেছিল।

—ওকে। এবং দীপ্তিই বলেছিল, মোটিভের ক্লু হিসেবে একটুকরো কাগজ হাতে ধরে থাকবে—তাতে সংকেত বাক্যে সাবোটাজের উল্লেখ পাওয়া যাবে?

—সবই তো বলেছি।

—কিন্তু আমরা ওর হাতে তেমন কোন কাগজের টুকরো পাই নি!

—সেজন্য কি আমি দায়ী?

সবাই হেসে উঠলেন আমার জবাব শুনে। কর্ণেল বললেন—আচ্ছা, আচ্ছা! মাত্র আর একটা প্রশ্ন! তুমি যখন নদীর ধারে যাও, কিংবা সেখান থেকে ফিরে এসো, তখন কোন শব্দ শুনেছিলে?

—হুঁ। অনেক শব্দ।

অফিসাররা নড়ে উঠলেন। কর্ণেল ব্যগ্র হয়ে বললেন—অনেক শব্দ? কিসের?

—পাখিটাখির।

সবাই হাসলেন। কর্নেল বললেন—কাকেও দেখেছিলে, জঙ্গলে অথবা খুনের জায়গায়?

—হুঁউ। তবে খুনের জায়গায় নয়। পশ্চিমের একটা টিলায়।

ফের সবাই নড়ে বসলেন। কর্নেল বললেন—দেখেছিলে? চিনতে পেরেছিলে?

—হুঁউ।

কিষাণ সিং বললেন—কে সে? চোপরা না দিব্যেন্দু?

—কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। বায়ুসেবনে বেরিয়েছিলেন।

কর্নেল গোমড়ামুখে কী অস্ফুট বললেন। কিষাণ সিং দরজার দিকে ইশারা করে কাকে বললেন—সোনালী ব্যানার্জি! জয়ন্তবাবু, আপনি প্লীজ ওখানটায় বসুন।

কোণের সোফায় গিয়ে বসলুম। বুঝলুম, এখন বেরুনো যাবে না। সিগ্রেট ধরিয়ে টানতে থাকলুম। সোনালী পাথরের মূর্তির মতো ঘরে ঢুকল এবং নমস্কার করে ওঁদের সামনের চেয়ারে বসল।

নামধাম পরিচয় পর্ব হল। তারপর জেরা চলতে থাকল।

—মিস ব্যানার্জি, ঠিক কখন প্রথমে আপনারা মার্ডার ফানের কথাটা ভেবেছিলেন এবং প্রথম কে ভেবেছিল?

—দীপ্তি। কদিন আগে কর্নেলকে বাবা আমার জন্মদিনে নেমন্তন্ন করতে পাঠালেন। রত্না আমার সঙ্গে যেতে চাইল। দীপ্তিও তা শুনে যাবে বলল। কর্নেলের বাড়ি থেকে ফেরার সময় রাস্তায় ট্যাকসিতে দীপ্তি বলল—ওই ভদ্রলোক তাহলে গোয়েন্দা? ওকে নিয়ে তোর জন্মদিনে একটা ফান করলে কেমন হয়? তারপর…

—হুম! ডেডবডি সাজতে কি দীপ্তিই চেয়েছিল?

—হ্যাঁ। ট্যাকসিতে বসেই সব ঠিক হয়ে যায়।

হঠাৎ কর্নেল বললেন—ট্যাকসির নাম্বারটা কি লক্ষ্য করেছিলে সোনালী?

—আমি করি নি। ওসব কেই বা লক্ষ্য করে? কেন বলুন তো?

—জাস্ট এ চান্স! যদি দৈবাৎ করে থাকো।

—করি নি। বলেই সোনালী নড়ে উঠল।—হ্যাঁ, আমি করি নি। কিন্তু…

—কিন্তু দীপ্তি…

—দীপ্তি করেছিল?

—হ্যাঁ। ব্যাপারটা এখন মনে হচ্ছে, ভারি অদ্ভুত। জানেন? হাওড়া স্টেশন থেকে ট্যাকসি করে আমরা ভবানীপুরে মামার বাসায় গেলুম, সেটাই আমাদের ইলিয়ট রোডে কর্ণেলের বাসায় নিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফেরার সময়ও একই ট্যাকসি। দীপ্তি এটা লক্ষ্য করেছিল। বলেছিল—ব্যাপার কী রে? এই একটা ট্যাকসিই পাচ্ছি খালি? আমি অবশ্য ট্যাকসিওলাকে লক্ষ্য করি নি। বলেছিলুম—তোর চোখের ভুল। বাইরের লোক তো তুই, তাই সব ট্যাকসিওয়ালাকে একই লোক বলে ভুল করছিস! যেমন সব চীনেম্যানকে দেখে একই লোক মনে হয়!

কিষাণ সিং বললেন—বেশ ইন্টারেস্টিং তো!

কর্ণেল বললেন—হাওড়া স্টেশনের ট্যাকসি ভবানীপুরে নিয়ে যায় তোমাদের। তারপর সম্ভবত ওই ট্যাকসিটাই তোমার মামার বাড়ির সামনে অপেক্ষা করছিল এবং তোমরা রাস্তায় নামতেই নিজে থেকে অফার দেয়।…

সোনালী সায় দিয়ে বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ! লোকটা আমাদের ডেকে বলল—আইয়ে মেমসাব! দীপ্তি বলল—সেই ট্যাকসিঅলা না? আমি আর রত্না গ্রাহ্য করি নি। ট্যাকসি পাওয়াই বড় কথা।

—রাইট। তোমরা যখন আমার বাসায় গেলে, আমি অভ্যাসমত জানলায় দাঁড়িয়েছিলুম। দেখলুম ট্যাকসিটা তোমাদের নামিয়ে দিয়েই ফিরল। কিন্তু চলে গেল না। ওধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নাম্বারটা আমার মনে আছে।…বলে কর্ণেল পকেট থেকে নোটবই বের করলেন। বললেন—লিখে নিন মিঃ সিং। এক্ষুনি কলকাতায়

খোঁজ নিতে হবে। এটা বিশেষ জরুরী।

কিষাণ সিং একজন অফিসারকে তক্ষুণি ফোনের কাছে পাঠালেন। তারপর কর্ণেল বললেন—সোনালী, দীপ্তির ব্যক্তিগত জীবনের দু-একটা কথা তোমার মুখেই শুনতে চাই।

—বলুন। যা জানি, বলব।

—ইয়ে, ওর কি কোন প্রেমিক ছিল? লজ্জার কারণ নেই, মা বলো।

সোনালী মুখ নামিয়ে বলল—দিব্যের সঙ্গে একসময় ওর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাছাড়া দিব্যের সঙ্গেই ওর বিয়ের কথাও চলছিল। দিব্য রিফাইনারিতে চাকরিটা পেয়ে গেলেই বিয়েটা হত।

—আই সী! কিন্তু ঘনিষ্ঠতাটা একসময় ছিল বলছ কেন?

—ইদানীং দীপ্তি যেন দিব্যকে এড়িয়ে চলছিল। আর ..

—হুম! বলো!

—আর রণধীরদার সঙ্গে একটু বেশি মেলামেশা করছিল।

—মানে তোমার বাবার প্রাইভেট এ্যাসিস্ট্যান্ট ছেলেটির সঙ্গে?

—হ্যাঁ। তবে এ নিয়ে দিব্যর সঙ্গে কোনরকম মনকষাকষি দেখি নি। আমরা একসঙ্গেই বেশিরভাগ সময় থাকি। তেমন কিছু ঘটলে টের পেতুম। দিব্যও এসব মাইণ্ড করার ছেলে না।

—ইদানীং দীপ্তির মধ্যে কোন বিশেষ ভাবান্তর টের পাচ্ছিলে কি?

সোনালী একটু ভেবে বলল—তেমন কিছু দেখি নি। তবে ..

—তবে?

—মাঝেমাঝে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থাকত। জিগ্যেস করলে কিছু বলবে মনে হত—কিন্তু শেষ অব্দি বলত না। শুধু বলত—শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

—আচ্ছা, ওকথা থাক। আজ সকালে তুমি দীপ্তিকে ওভাবে রেখে বারান্দায় চলে এলে! তখন বারান্দায় রত্না ছিল। তাই না?

—হ্যাঁ। আমরা হুজন ছিলুম।

—ওদিক থেকে কোন শব্দ শুনতে পেয়েছিলে? কিংবা কাকেও যেতে দেখেছিলে?

—না।

—ভেবে বলো।

সোনালী জোরের সঙ্গে মাথা দোলাল।—আমরা হুজনেই ওদিকে তাকিয়েছিলুম।

—হুম। তারপব প্রথমে দিব্য না চোপরা ফিরে এল?

—চোপরা।

—কোনদিক থেকে?

—পুবদিক।

—তার মধ্যে কোন ভাবান্তর ছিল?

—নাঃ। হাসতে হাসতে এল।

—ভেবে বলো। কারণ তোমার উইশফুল থিংকিং হতে পারে।

সোনালী ভেবে নিয়ে জবাব দিল—মনে হচ্ছে, হাসতে দেখেছি। তারপর একটু গম্ভীর হয়েছিল মনে পড়ছে। একটু...হ্যাঁ কর্ণেল...: একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। কারণ রত্না ওকে ডাকলে শুনতে পেল না। তখন রত্না বলল, খুব ঘাবড়ে গেছ মনে হচ্ছে। ও যেন চমকে উঠে আবার হাসতে লাগল।

—দিব্য এল কোনদিক থেকে? কতক্ষণ পরে?

—পশ্চিমদিক থেকে। মিনিট তিনচার পরে। দিব্যকে কিন্তু খুব নার্ভাস মনে হচ্ছিল। এখন মনে পড়ছে। ও এসেই বলল—খুব ধাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে যেন।...বলেই সোনালী নড়ে উঠল।—কর্ণেল! মনে পড়ছে, দিব্য যেন হাঁফাচ্ছিল!

—বল কী!

—হ্যাঁ। রত্না ওকে ধমক দিয়ে বলল—দাদা সবতাতেই নার্ভাস হয়ে পড়ে। আমি ঠাট্টা করে বললুম—হবু ব্রাইড ইজ মার্ডারড।

কষ্ট হচ্ছে না বুঝি ? তা শুনে দিব্য রাগ দেখিয়ে বলল—খুব ডেঁপো মেয়ে হচ্ছ ! সেই সময় দেখি জয়ন্তবাবু ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন বোকার মতো। পলিমাটিগুলো ছড়িয়ে চলে আসার কথা। অথচ উনি যেন কী দেখছেন। তাই আমি দৌড়ে গেটে গেলুম ওকে ডাকতে।

—তার মানে জয়ন্তকে তুমি ফিরতে দেখ নি ?

—না। মানে, তখন আমরা নিজেদের মধ্যে ওইসব কথাবার্তা বলছি তো—তাই ওদিক আর তাকাচ্ছিলুম না !

—রত্না আর তুমি বারান্দায় থাকার সময়ও কেউ ওখানে গেলে তাহলে তোমার চোখে পড়ার চান্স বেশি ছিল না।

সোনালী ব্যস্ত হয়ে বলল—না না, ছিল। তখন…

—অবশ্য দক্ষিণের ঢালু থেকে ঝোপ ঠেলে কেউ এলে তাকে পেতে না।

—হ্যাঁ। তা পেতুম না।

—ঠিক আছে সোনালী। তুমি জয়ন্তের কাছে গিয়ে বসো। নাকি মিঃ সিং অর এনিবডি কিছু প্রশ্ন করবেন ?

সবাই মাথা দোলালেন। সোনালী আমার পাশে এসে নিঃশব্দে বসে গেল। কিষাণ সিং ডাকলেন—দিব্যেন্দু চ্যাটার্জিকে ডাকো।..

দিব্যেন্দুর প্রাথমিক পরিচয়পর্ব শেষ হবার পর যথারীতি জেরা শুরু হল। আমি ও সোনালী দুজনেই তাকিয়ে রইলুম দিব্যের দিকে।

কিষাণ সিং বললেন—মার্ডার ফানের কথা কখন কোথায় প্রথম কার কাছে শোনেন ?

—কাল রাত্রে সোনালী রত্না আর দীপ্তি তিন জনের কাছেই।

—তিনজনের কাছে ? দিস ইজ এ্যাবসার্ড। নিশ্চয় প্রথমে একজনই বলেছিল। কে ?

দিব্য ভড়কে গিয়ে বলল—হ্যাঁ, মানে তখন বারান্দায় তিনজনই

ছিল। প্রথমে অবশ্য সোনালীই বলল।

—হুম। শুনে আপনি কী বললেন?

—বাধা দিলুম। বললুম, এ বড্ড বাজে ব্যাপার। অন্য কোন ফানের প্ল্যান করা যাক। ওরা শুনল না। অগত্যা আমি মত দিলুম।

—কেন বাধা দিয়েছিলেন?

—ব্যাপারটা...ব্যাপারটা আমার কাছে উদ্ভট মনে হয়েছিল।

—ফান মানেই উদ্ভট কিছু।

—তাহলেও দীপ্তিকে আমি ডেডবডি করাটা পছন্দ করি নি।

কর্ণেল বলে উঠলেন—দীপ্তিকে তো তুমি ভালবাসতে দিব্য? না—না, লজ্জার কারণ নেই। আমরা আধুনিক যুগের মানুষ।

দিব্য মাথাটা একটু দোলাল।

—তোমার সঙ্গে তো ওর বিয়ের কথা ছিল?

—হ্যাঁ। কিন্তু...

—বলো, বলো!

—ইদানীং দীপ্তি আমাকে এড়িয়ে থাকতে চাইত যেন। আমি অবশ্য তাতে কিছু মাইণ্ড করি নি। ও বড্ড খামখেয়ালি মেয়ে ছিল। আমার ধারণা, শিল্পীরাই খামখেয়ালী।

—দীপ্তি ইদানীং চোপরার সঙ্গে মেলামেশা করত কি?

দিব্য মুখ নামিয়ে বলল—হ্যাঁ। আজ ভোরেও চোপরা ওকে গাড়ি করে এখানে পৌঁছে দেয়। অথচ কথা ছিল, আমিই ওকে নিয়ে আসব। তাই বেরুতে যাচ্ছি, দেখি চোপরার গাড়িতে ও আসছে। মানে গাড়িটা তখন গেটে ঢুকছিল।

কিষাণ সিং বললেন—মিঃ চ্যাটার্জি! গত আগস্টে রাণীডিহির ইভনিং লজ নামে একটা বাড়ি থেকে আপনাকে জুয়াখেলার জন্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তখন আপনি মাতাল অবস্থায় ছিলেন। খবর পেয়ে মিঃ ব্যানার্জি—মানে আপনার মেসোমশাই আপনাকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। শুধু এই নয়—আরও দুবার

আপনাকে মারামারির অভিযোগে এ্যারেস্ট করা হয়েছিল এবং আপনার মেসোমশাইয়ের হস্তক্ষেপে ছাড়া পান। এসব কারণেই রিফাইনারিতে আপনার চাকরি পাবার অসুবিধা হচ্ছে। দিস্ ইজ দি রেকর্ড। এবার বলুন, ঠিক এসবের জন্যেই কি দীপ্তির সঙ্গে আপনার ছাড়াছাড়ি হয়েছিল?

সোনালী মুখ ফিরিয়েছে। আমি অবাক। কর্ণেল দিব্যের দিকে তাকিয়ে আছেন। ঘরটা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকল। কিষাণ সিং আবার বললেন—জবাব দিন মিঃ চ্যাটার্জি!

দিব্য ঠোঁট কামড়ে বলল—না।

—আপনার বাবা মা কলকাতায় থাকেন। তাই তো?

—হ্যাঁ।

—আপনাকে মিঃ অনিরুদ্ধ ব্যানার্জি কাছে এনে রেখেছেন আপনার স্বভাব শোধরাতে। অস্বীকার করে লাভ নেই। অনিরুদ্ধ বাবুর কাছেই আমরা সব শুনেছি।

—না। মেসোমশাই আমার চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন বলে ডেকেছিলেন। আমার বোন রত্নার কাছে জানতে পারেন।

—আপনার বোন রত্নার নামেও কিছু রেকর্ড আছে দিব্যবাবু।

দিব্য মুখ তুলল। সাদা হয়ে গেছে মুখটা।

—রত্না একসময় এক আন্তর্জাতিক টেররিস্ট দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। তাই ওকেও আপনার বাবা এখানে পাঠিয়ে দেন। আমাদের ধারণা, আপনারা ভাইবোন দুজনেই সেই টেররিস্ট দলের সঙ্গে এখনও যুক্ত। অস্বীকার করতে পারেন?

দিব্য হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—মিথ্যা। একেবারে মিথ্যা। কে বলল এসব?

—রেকর্ড। আচ্ছা, এবার বলুন, গত সপ্তাহে মিঃ চোপরা আর আপনি সান ভিউ রেঁস্তোরায় ঘুষোঘুষি করেছিলেন। আপনাদের সঙ্গে আরও একজন ছিল। তাই না?

—হ্যাঁ। চোপরা আমাকে জাত তুলে গাল দিয়েছিল।

—আপনাদের তৃতীয় লোকটির নাম বলুন।

—ও আমার এক বন্ধু। দিল্লিতে থাকত। নাম রাজীব শেরগিল। এখানে বেড়াতে এসেছিল। ওর কথাতেই তর্ক বাধে। শেষে ঝগড়া হয় চোপরার সঙ্গে। প্রভিন্সিয়ালিজম নিয়ে।

—আমরা জানি রাজীব শেরগিলের বয়স চল্লিশের ওপারে। আপনি তিরিশের নীচে। বন্ধুতার অবলম্বনটা কী?

—দিল্লিতে আলাপ হয়েছিল। আলাপ থেকেই বন্ধুতা। কেন? ওই জয়ন্তবাবু যদি এই ওল্ড ম্যানের বন্ধু হতে পারেন—আমার বেলা দোষ হবে কেন?

কর্ণেল হো হো করে হেসে উঠলেন। কিষাণ সিং বললেন—আপনি নিশ্চয় জানেন, ওয়াটারট্যাংকের কাছে যে লোকটির লাশ পাওয়া গেছে—সে লোকটাই সেই রাজীব শেরগিল?

দিব্য মুখ নামিয়ে বলল—হ্যাঁ।

—আমরা আপনাকে ওই হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে গ্রেফতার করতে পারি।

দিব্য হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—কেন? আমি ওকে খুন করি নি। কেন ওকে খুন করব?

কিষাণ সিং একটু হেসে বললেন—ঠিক আছে। এবার বলুন, এই সিগ্রেটের টুকরোদুটো মার্ডার ফানের ক্লু হিসেবে আপনিই কি ফেলে রেখেছিলেন ওখানে?

কাগজের মোড়ক খুললে দিব্য দেখে নিয়ে বলল—আমি তো মোটে একটা টুকরো ফেলেছিলুম। আর...এ কী! দুটোই যে আমার ব্র্যাণ্ডের!

কর্ণেল হাসতে হাসতে বললেন—বোঝা যাচ্ছে, খুনী ক্লু-র ওপর গুরুত্ব দিতে চেয়েছে।

কিষাণ সিং বললেন—ফোরেনসিক পরীক্ষায় ঠোঁটের এবং

আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যাবে ফিল্টারের কাছে। তখন বোঝা যাবে সব। ছোরার বাঁটেও আঙ্গুলের ছাপ থাকবে।

দিব্য বলে উঠল—হাতে দস্তানা পরলে?

অমনি কিষাণ সিং একটু ঝুঁকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে বলেলেন—আপনি বলছেন! মাই গুডনেস! কীভাবে জানলেন? পরেছিলেন—তাই না?

দিব্য থতমত খেয়ে বললে—জ্যাস্ট কমনসেন্স!

—এনাফ্! আপনি ওখানে গিয়ে বসুন। এ্যাণ্ড নেক্সট্ মিঃ রণধীর চোপরা।

রণধীর স্মার্ট হয়ে হয়ে হাসিমুখে ঢুকল। নমস্তে করে বসল। কিষাণ সিং তার প্রাথমিক পরিচয় যথারীতি নিয়ে জেরাপর্বে চলে গেলেন। লক্ষ্য করলুম, দিব্যের সঙ্গে ওর ঝগড়া বা দীপ্তিসংক্রান্ত কোন প্রশ্নই করছেন না। আজ সকালের ঘটনাই তুলছেন।

—আচ্ছা মিঃ চোপরা, আপনি যখন পুবদিকে বড় রাস্তায় গেলেন, সেখান থেকে আপনাদের মার্ডার ফানের জায়গাটা কি দেখা যাচ্ছিল?

—হ্যাঁ। কারণ ওখানটা উঁচুতে। এই টিলার দক্ষিণ অংশ ওটা। আর আমি ছিলুম অনেকটা ফাঁকা বড় রাস্তায়। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল জায়গাটা।

—কাকেও দেখতে পেয়েছিলেন? মানে—আপনি চলে আসার পর?

—হ্যাঁ।

কর্ণেল সোজা হয়ে বসলেন। কিষাণ সিং বললেন—দেখতে পেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—সে কে?

—চিনতে পারি নি। সবুজ ফুলহাতা জামা ছিল গায়ে। প্যান্ট

দেখা যাচ্ছিল না ঝোপের আড়ালে। মুখটা ওপাশে ছিল বলে দেখতে পাই নি। বেশ মোটাসোটা লোক।

—মানে ফ্যাটি ?

—হ্যাঁ। প্রকাণ্ড। তবে বেঁটে বলেই মনে হচ্ছিল।

—তাকে দেখে আপনার কিছু মনে হয় নি ?

—হয়েছিল। ভাবলুম, খেলাটা বরবাদ হয়ে গেল হয়তো। এক্ষুনি হুলুস্থুল বাধবে। কিন্তু লোকটা ঝোপের আড়ালে ডুবে গেল। তখন ভাবলুম, কেউ বেড়াতে বেরিয়েছে। উপত্যকার দিকে সোজাসুজি নেমে গেল। তারপর আর তাকে দেখি নি।

—সবুজ ঝোপঝাড়ের মধ্যে সবুজ জামা! চোখে পড়া তো অস্বাভাবিক!

চোপরা একটু ইতস্তত করে বলল—না, মানে--তখন আমার ওখানেই মন পড়ে ছিল কি না! দ্যাটস ন্যাচার‍্যাল। তাই না স্যার ?

কিষাণ সিং জবাব দিলেন না। কর্ণেল বললেন—রাইট, রাইট।

—তাছাড়া স্যার, ব্যাপারটা আমার খুব গোলমেলে লাগছিল!

কর্ণেল বললেন—হুম! কেন বলুন তো ?

—দীপ্তির মার্ডার মোটিভটা শুনে যদিও খুব ফানি মনে হয়েছিল। পরে মনে হল—দীপ্তি কি কোন ইঙ্গিত দিচ্ছে। মানে আমাকেই যেন—

—ইঙ্গিত ? কিসের ?

—মানে, অয়েল রিফাইনারিতে স্যাবোটাজের। দ্যাটস অলসো ন্যাচারাল।

—হুম। ঠিক বলেছেন। কিন্তু দীপ্তির সঙ্গে তো আপনার ইদানীং ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল ?

—হ্যাঁ। একটু একটু। আই লাইকড হার।

—দুজনে একসঙ্গে ঘুরেছেন, কিংবা নিভৃতে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছেন ?

—হুঁউ। ছাটস ন্যাচারাল।

—ওইসব সময় দীপ্তি আপনাকে অনায়াসে তেমন কিছু গুপ্ত ব্যাপার থাকলে জানাতে পারত?

—তা তো পারতই।

—কিন্তু জানায় নি। তাই না?

—না। সম্ভবত গত রাতেই ও তেমন কিছু আঁচ করে থাকবে। তাই...

—এক মিনিট। তাহলে তো আজ ভোরে ওকে যখন নিয়ে এবাড়ি এলেন, তখন বলতে পারতো আপনাকে?

—ও চাপা মেয়ে ছিল। কিংবা হয়তো স্যাবোটাজকারীদের কেউ গতরাতে বারান্দায় আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিল। তাকেই দীপ্তি সতর্ক করতে চেয়েছিল।

—মিঃ চোপরা। আপনি বয়সে তরুণ হলেও খুব বুদ্ধিমান্। খুবই যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছেন। কিন্তু. ভেবে দেখুন, কারা উপস্থিত ছিল তখন? জয়ন্তবাবু, দিব্য, রত্না আর সোনালী। এখন বলুন—আপনার ধারণা অনুযায়ী কে স্যাবোটাজকারী দলের লোক হতে পারে? খুব ভেবে বলবেন কিন্তু।

চোপরা একটু ভেবে নিয়ে বললে—আমি কিন্তু স্ট্রেটকাট কথাবার্তা বলা পছন্দ করি। এজন্যই দিব্যের সঙ্গে আমার মাঝেমাঝে বেধে যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস দিব্যকেই সতর্ক করতে চেয়েছিল দীপ্তি। এই সঙ্গে লক্ষ্য করবেন, দিব্যের সঙ্গে ওর বিয়ে প্রায় ঠিক। অথচ ও দিব্যকে এড়িয়ে চলছিল ইদানীং। অতএব আমার ডিসিশানে দাঁড়াচ্ছে, দীপ্তি দিব্যের কার্যকলাপ টের পেয়েই ঘৃণা করে সরে এসেছিল।

—এবং আপনার ঘনিষ্ঠ হয়েছিল!

কারেক্ট স্যার। ভেরি ভেরি কারেক্ট। দিব্যের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী আমি। আমি ছাড়া দিব্যের সঙ্গে লড়ার তাকত এখানে কারো নেই,

দীপ্তি জানত। কিংবা এও হতে পারে, আমি অয়েলরিফাইনারির ডিরেক্টরের পি. এ। আমার সঙ্গে মেশার মধ্যে দীপ্তির একটা উদ্দেশ্য থাকতেও পারে। তা হল—দিব্যকে সতর্ক করে দেওয়া—সাবধান, যা জানি—কর্তৃপক্ষের কানে তুলে দিতে পারি! ইজ ইট ইল্লজিক্যাল?

কর্ণেল সায় দিয়ে বললেন—রাইট, রাইট। মিঃ সিং! এবার আপনি কিছু জানতে চাইলে প্রশ্ন করুন।

কিষাণ সিং বললেন—না। আমার প্রশ্ন নেই। নেক্সট্ বত্না চ্যাটার্জি।…

রত্না সাদা মুখে এল। যন্ত্রের মতো হাত তুলে নমস্কার করল। দেখলুম ওর পায়ের কাছে শাড়ির পাড় থরথর করে কাঁপছে।

—আপনি রত্না চ্যাটার্জি?

—হুঁ।

বাবার নাম, ঠিকানা, পেশা এসব কিছুই ওকে জিজ্ঞেস করা হল না, এতে অবাক হলুম। কিষাণ সিংয়ের কাছে একটা ফাইল ছিল। ফাইলটা খুলে আধমিনিট কী দেখার পর উনি মুখ তুললেন। তারপর বললেন—দীপ্তির সঙ্গে গত ১৩ই সেপ্টেম্বর সকালে আপনি পাতাল-কালীর মন্দিরে গিয়েছিলেন কি?

রত্না মাথা দোলাল।

—কেন?

রত্না একটু ইতস্তত করে আস্তে বলল—যে জন্যে সবাই যায়!

—মন্দিরে যাবার কথা কে তুলেছিল? আপনি—না দীপ্তি?

—দীপ্তি ভক্তিমতী মেয়ে ছিল—এমন কথা আমরা এখনও কারো কাছে শুনি নি। ওর মামা-মামী এবং মামাতো ভাইবোন বরং বলেছেন, দীপ্তির ওসব বিশ্বাসই ছিল না। আপনি কী বলেন?

—হ্যাঁ! ও নাস্তিকটাইপ ছিল। বরাবর ধর্মটর্ম নিয়ে ঠাট্টা করতো।

—তাহলে, বলুন দীপ্তি পাতালকালীর মন্দিরে নিছক বেড়াতে গিয়েছিল ?

—আমাকে তাই বলেছিল। পরে অবশ্য···

—হুঁ, বলুন।

—পরে আমার সন্দেহ হয়েছিল, ওর যেন অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে।

—সেটা কী ?

—কারও সঙ্গে দেখা করা।

—কেন এমন মনে হল আপনার ?

—ওর চোখ-মুখের ভাব দেখে। খুব খুঁজছিল—মানে ভিড়ের সব মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। তা লক্ষ্য করে আমি ওকে বলেছিলুম, কাকেও খুঁজছিস নাকি রে ? ও জবাব দিয়েছিল না, এমনি। চেনা কেউ আছে নাকি দেখছি। কিন্তু কারও সঙ্গে ও কথা বলে নি শেষ পর্যন্ত। অবশ্য, আমার খটকাটা থেকেই গিয়েছিল। ফেরার পথে যখন ওকে চেপে ধরলুম, ও কবুল করল না। আগের মতোই নিছক বেড়াতে আসার কৈফিয়ৎ দিল। তখন বললুম, তোর কি হঠাৎ দেবদেবতায় বিশ্বাস ফিরে এসেছে ? দীপ্তি হাসল শুধু। ভাবলুম, দাদার সঙ্গে একটা কিছু গণ্ডগোল হয়েছে, তাই হয়তো মনে অশান্তি চলছে বড্ড। পাতালেশ্বরীর কাছে মনে মনে তাই প্রার্থনা করে গেল। অবশ্য খটকাটা আমার থেকেই গেল।

একটু ভেবে ও ফাইলটা দেখে নিয়ে কিষাণ সিং বললেন—বাড়ি থেকে মন্দির এবং মন্দির থেকে বাড়ি সারাক্ষণ আপনি ওর সঙ্গে ছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—যাবার সময় কিসে গেলেন ?

—রিকশোয়।

—ফিরলেন কিসে ?

—রণধীরদার গাড়িতে। হঠাৎ পেয়ে গেলুম। ও স্টেশন থেকে আসছিল।

—হুম্, আমরা সেটা জানি। রণধীর চোপরার গাড়িটা আপনাকে আগে নামিয়ে দিয়ে পরে দীপ্তিকে পৌঁছে দিতে যায়। অথচ আগেই দীপ্তির মামার বাসাটা পড়ে। তাই না?

—হ্যাঁ। ব্যাপারটা আমার খারাপ লেগেছিল নিশ্চয়। চোপরার সঙ্গে ইদানীং ওর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। দাদার জন্যে আমার কষ্ট হত। কিন্তু এসব তো দীপ্তিকে বলা যায় না।

—যাকগে, এবার বলুন, গাড়িতে আপনারা কী আলোচনা করেছিলেন?

—সোনালীর জন্মদিনের কথা। রণধীরদা বরাবর সব এ্যারেঞ্জমেন্ট করে দেয়। ন্যাচারালি ওর সঙ্গে এ নিয়ে কথা হচ্ছিল।

—আপনারা কলকাতা গিয়ে কর্ণেল সরকারকে নেমন্তন্ন করবেন, একথাও নিশ্চয় উঠেছিল?

—হুঁ।

—চোপরা কর্ণেল সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেছিলেন?

—না। মানে জিগ্যেস করল যে ভদ্রলোক কে? আমরা ওর পরিচয় দিলে ও খুব উৎসাহ দেখিয়ে বলল, দারুণ জমবে! গোয়েন্দাদের কখনও দেখি নি। তারপর কথায় কথায় ফাংশানের ডিটেলস এসে পড়ল। তখন রণধীরদা বলল, এক কাজ করা যায়। এ্যাজ ইউ লাইক ইট খেলার বদলে অন্য কোন ফান হোক না? মার্ডার ফান! গোয়েন্দা ভদ্রলোককে নিয়ে মজা করা যাক।

ঘরের সবাই নড়ে বসলেন। আমরা কজন, সোফায় বসে আছি যারা, তারাও ঘুরে টেবিলের দিকে তাকালাম। আড়চোখে দেখি, চোপরা শুকনো হাসছে। কর্ণেল হেসে উঠলে ওই ভাবটা ঘুচে গেল।

কর্ণেল বললেন—হুম। তাহলে দীপ্তির মাথায় মার্ডার ফানের প্রস্তাবটা প্রথম ওঠে নি, বোঝা গেল।

আমাদের পাশ থেকে চোপরা বলে উঠল—ছাটস ন্যাচারাল! আমি আগাথা ক্রিস্টি প্রচুর পড়েছি। তা থেকেই ওটা মাথায় এসেছিল। নিশ্চয় এটা কোন ক্রাইম নয়!

কিষাণ সিং হাত তুলে বললেন—আপনি কোন কথা বলবেন না, প্লীজ।

রত্না ক্রমশ আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠেছে। সে বলল—কিন্তু এটা সত্যি যে দীপ্তি নিজেই ভিকটিম হতে চেয়েছিল। ওই গাড়িতে বসেই কি ভিকটিম হবার প্রস্তাব দীপ্তি দিয়েছিল?

রত্না জোরে ঘাড় নাড়ল। —না, না। ও তখন জোর আপত্তি করেছিল। এসব বাজে খেলা—অন্য কিছু ভাবো: দীপ্তি বলেছিল। পরে বাসায় ফিরে সোনালীকে মার্ডার ফানের কথা বললে সোনালীও আপত্তি করেছিল। কিন্তু শেষে দেখি, দীপ্তিই মার্ডার ফানের ব্যাপারে জেদ ধরেছে।

—আপনি যে প্রথমে সোনালীকে মার্ডার ফানের কথা বলেছিলেন, তা সোনালী কিন্তু আমাদের বলে নি। আমার পাশ থেকে সোনালী বলল, ভুলে গিয়েছিলুম। এখন মনে পড়ছে, রত্না বাইরে থেকে ফিরে ওই প্রোপোজালটা দিয়েছিল।

কিষাণ সিং ফের হাত তুলে বললেন—কথা বলবেন না, প্লীজ।

হঠাৎ কর্ণেল একটু ঝুঁকে প্রশ্ন করলেন—ইয়ে রত্না, তোমার দাদা দিব্যেন্দুর কি কোন সবুজ পানজাবি আছে?

রত্না বলল—হ্যাঁ। কেন?

অমনি একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। দিব্যেন্দু আমাদের কাছ থেকে তড়াক করে এক লাফ দিয়ে উঠে দরজার দিকে এগোল। একজন পুলিশ অফিসার ওর কলার ধরে ফেললেন। দিব্য ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। পারল না। এই সময় কর্ণেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন মিঃ সিং! আমার মনে হচ্ছে, আপাতত এ পর্যায় এখানেই শেষ। অবশ্য আপনার ইচ্ছে করলে এগোতে পারেন। আমি

একটু বাইরে যেতে চাই।

কিষাণ সিং একটু হেসে বললেন—ক্ষমা করবেন কর্ণেল। দিস ইজ দি অফিসিয়াল প্রসিডিওর। আমরা এখানেই থামতে পারি না। বাড়ির সারভ্যান্টদের প্রশ্ন করা বাকি আছে।

কর্ণেল জিভ কেটে বললেন—সরি, ভেরি সরি মিঃ সিং। দ্যাটস কারেক্ট। বলে টেবিল থেকে উঠে এসে আমার দিকে তাকালেন। তারপর কিষাণ সিংয়ের দিকে ঘুরে বললেন—মিঃ সিং। আমার এই হতভাগ্য বন্ধুটিকে কি বাইরে যাবার অনুমতি দেবেন?

কিষাণ সিং হেসে বললেন—অবশ্যই।

—এস জয়ন্ত, আমরা একবার বাইরে খোলা হাওয়ায় গিয়ে বিশ্রাম নিই।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। বাইরে লনে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে বললুম—কর্ণেল, তাহলে দিব্যকে মনে হচ্ছে গ্রেফতার করা হল।

কর্ণেল আনমনে জবাব দিলেন—তাই মনে হচ্ছে। দিব্যেন্দুর ওই সবুজ জামাটাই ভাইটাল এ কেসে। অবশ্য যদি চোপরার কথাটা সত্যি হয়, তবেই। যাক গে, এস—আমরা একবার নদীর ধারটা ঘুরে আসি।

নদীর ধারে যেতে হলে এই ছোট রাস্তা ধরে যেতে হবে, কিন্তু কর্ণেল ওদিকে গেলেন না। সোজা অকুস্থলের পাথরটার কাছ দিয়ে ঝোপঝাড় ভেঙে চললেন। দেখলুম, দীপ্তির লাশটা সরানো হয়েছে। পাথরের একধারে কিছু রক্ত লেগে আছে। ঘাসে ও মাটিতেও আছে। সেটা সত্যিকার রক্ত হতেও পারে, আবার সোনালীর পেন্টও হতে পারে। কিন্তু একবার তাকিয়েই চোখ ফেরালুম। যেন দীপ্তিকে দেখতে পাচ্ছিলুম—একটু ঝুঁকে পাথরে গাল রেখে শুয়েছে। তাজা ফুলের মতো একটা মেয়ে—স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য নিয়ে জন্মেছিল এই কুৎসিত পৃথিবীতে। খুব কষ্ট নিয়েই পা বাড়ালুম। জানতুম কর্ণেল বিস্তর পাহাড়ে চড়েছেন। তাই এই ঢালু দুর্গম জায়গায় ওর কোন কষ্ট না হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আমার মতো আনাড়ির পক্ষে মারাত্মক।

একখানে পাথরে পা স্লিপ করে গড়িয়ে পড়লুম এবং গড়াতে গড়াতে প্রায় পনের-কুড়ি ফুট নীচে একটা গর্তে গিয়ে আছাড় খেলুম। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি, শুনি কর্ণেল ওপরে দাঁড়িয়ে হাসছেন।

রেগে বললুম—আর কখনো কোথাও যাব না আপনার সঙ্গে। গেলেই খুনোখুনিতে জড়িয়ে পড়ব এবং বিদঘুটে কাণ্ড ঘটবে! ভ্যাট!

ওপর থেকে নেমে এসে কর্ণেল একটু হেসে বললেন—ডার্লিং, মাঝে মাঝে আছাড় খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। ছেলেবেলায় মানুষ প্রায়ই আছাড় খায়। এতেই বোঝা যায় প্রকৃতি ওইভাবে তাকে স্বাস্থ্য আয়ু সাহস ও সহ্যশক্তি যোগান দেন। বড় হয়ে আছাড় খাবার ব্যাপারে সতর্ক হয় মানুষ। এটা প্রকৃতির বিরুদ্ধতা। এ জন্যেই তো প্রকৃতি সুযোগ পেলেই মনে করিয়ে দেন যে ..

কর্ণেল প্রায়ই উদাত্তকণ্ঠে লেকচার দিচ্ছিলেন, হঠাৎ থেমে কি যেন দেখতে থাকলেন—কুঞ্চিত ভুরু। তারপর কোটের পকেটে হাত পুরে ছোট বাইনাকুলারটি বের করলেন। ওটা সবসময় সঙ্গে থাকে, জানা ছিল। কিন্তু সর্বনাশ! নির্ঘাৎ বাতিকগ্রস্ত বুড়ো প্রকৃতিবিদ্ কোন বিরল প্রজাপতি অথবা পাখি দেখতে পেয়েছেন এবং তার মানে এবার নাওয়া-খাওয়া বাদ দিয়ে হয়তো গোটা দিনটাই পাখিটার পিছনে বনবাদাড় নালা ডিঙিয়ে ঘোরাঘুরি করবেন—আমাকেও হন্যে করবেন!

কর্ণেল চোখে বাইনাকুলার নিয়ে সম্মোহিত মানুষের মতো—নিশির ডাকে যেমন যায়, এগোতে থাকলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। বুড়ো গোল্লায় যাক্, আমি বাংলোয় ফিরব। শরীর ক্লান্ত। মনও ভাল নেই। সেই ঢালু জায়গা বেয়ে অনায়াসে লেজে ভর করে দাঁড়ানো গিরগিটির মতো কর্ণেল ফাঁকা বরাবর অন্তত একশো ফুট এগোলেন। তারপর একটা প্রকাণ্ড পাথরের সামনে হাঁটু ভাঁজ করলেন। ওই অবস্থায় ওঁকে প্রায় তিনমিনিট চুপচাপ থাকতে দেখলুম। তারপর ঘুরে আমার দিক হাত নেড়ে বললেন—জয়ন্ত. দেখে যাও।

পৌঁছানো আমার পক্ষে বেশ কষ্টকরই হল। কিন্তু কৌতূহল আমাকে টেনে নিয়ে গেল। গিয়েই যা দেখলুম, অবাক হয়ে গেলুম। রণধীর চোপরার কথা মিথ্যে নয়—একটা সবুজ পানজাবি সাবধানে পাথরের ফাটলে রাখা হয়েছে।

কর্ণেল বললেন—হুম! দিব্যের বাঁচা কঠিন হয়ে গেল। চোপরা বলেছে, একটা বেঁটে মোটাসোটা লোক দেখেছিল। আসলে একটা জামা পরা অবস্থায় এই পানজাবি পরলে দূর থেকে তাই-ই দেখাবে। জয়ন্ত, দেখতে পাচ্ছ! পানজাবিতে রক্তের ছোপ লেগে আছে!

দেখে আঁতকে উঠলুম। বললুম—দিব্য এমন বোকার মতো কাজ করে ফেলল?

কর্ণেল বললেন—সবুজ পানজাবি পরে খুন করার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছ? সবুজ ঝোপঝাড় বা গাছের মধ্যে ক্যামোফ্লেজের কাজ করবে। কারো হঠাৎ নজরে পড়বে না। দ্বিতীয়ত…বলে উনি থেমে গেলেন। সাবধানে পানজাবিটার পকেটের দিকটায় আঙুলের চাপ দিলেন।

বললুম—কী?

—সিগ্রেটের প্যাকেট। মার্ডার ফানের ক্লু হিসেবে একটা টুকরো ফেলা হয়েছিল। কিন্তু দুটো পাওয়া গেছে। তার মানে পকেটে সিগ্রেট থাকায় আরেকটা সিগ্রেটের টুকরো ফেলে রাখা সম্ভব হয়েছে। খুনী যেন একটা খেলার ক্লু রেখে দিতে চেয়েছে। কেন?

প্রশ্নটা কর্ণেল আপন মনেই করলেন। বিরক্ত হয়ে বললুম—খুনী-খুনী করছেন কেন এখনও? দিব্য বললেই আমার কাছে আপনার জটিল কথাবার্তার মানে বোঝা সহজ হয়ে ওঠে।

কর্ণেল ঘুরে বললেন—দ্যাট ডিপেণ্ডস্ ডার্লিং!

—অন হোয়াট?

—আরও সাক্ষ্য-প্রমাণ।

—যেমন?

—দিব্য এই পানজাবিটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, নাকি পরে

পশ্চিমের দিকে ঘুরতে যাবার সুযোগে বাংলোয় ঢুকে নিয়ে এসেছিল ?

ভেবে বললুম—পশ্চিমেই তো বাংলো বাড়ির সদর গেট। কারো না চোখে পড়া স্বাভাবিক।

কর্নেল বললেন—ঠিক আছে। এটা এখানেই থাক। আমরা আপাতত বাংলোয় ফিরি। একটা কথা জয়ন্ত, তুমি ঘুণাক্ষরে একথা কারো কাছে প্রকাশ করবে না।

—নিশ্চয় নয়।

হাঁটতে হাঁটতে কর্নেল একটু হেসে বললেন—আমার ভয় হয় জয়ন্ত! যুবতী স্ত্রীলোকদের প্রতি তুমি সময়ে খুবই পক্ষপাতিত্ব দেখাও।

হো হো করে হেসে বললুম—দ্যাটস ন্যাচারাল!

—ওটা চোপরার মুদ্রাদোষ, তাই না জয়ন্ত ?

কী কথায় কী! বললুম—হ্যাঁ। এবং আমার ক্ষেত্রে সঙ্গদোষ। চোপরার কাছে শুনে এই হয়েছে।..

আন্দাজ ফুট বিশেক ওপরে উঠেছি, হঠাৎ কর্নেল দাঁড়ালেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন—উঁহু, হয়তো খুবই ভুল করছি। তুমি এক কাজ করো জয়ন্ত। এখানে ঝোপের আড়ালে বসলে পানজাবিটার ওপর লক্ষ্য রাখা যায়। তোমার রিভলবারটা কি কাছে আছে ?

—না। ওসব নিয়ে ঘোরাঘুরি করি নাকি ? কী দরকার ?

—ঠিক আছে। কোন দরকার নেই। তুমি প্লীজ একটু সাহায্য করো আমাকে। এখানে বসে চুপচাপ লক্ষ্য রাখো। কেউ এসে যদি দেখ পানজাবিটা সরাচ্ছে—কিংবা কিছু করছে—তুমি কিছু করবে না। সে যাই করুক, শুধু তাকে চিনে রাখবে। ব্যাস!

—বেশ।

—ভয়ের কোন কারণ নেই ডার্লিং। যথাসময়ে আমি ফিরে আসবো।

—অত বলার কী আছে? আজ তো নতুন আপনার চেলাগিরি করছি নে। বলে একটু হাসলুম। অবশ্য আমার বুকে কাঁপুনি শুরু হয়েছে ঠিকই।

কর্ণেল কাঁধে থাপ্পড় মেরে স্নেহ প্রকাশ করে চলে গেলেন। আমি ওৎ পেতে বসলুম। কর্ণেল না বলে দিলেও বুঝেছি, সিগ্রেট খাওয়া চলবে না। সকালের রোদ বেয়াড়া রকম বেশি তাপ ছড়াচ্ছে। ছায়ায় বসে আছি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে মন দিতেও পারছি না—এ এক অদ্ভুত অবস্থা। প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেল।

হঠাৎ দেখি নীচের একটা ঝোপের মধ্যে রত্না দাঁড়িয়ে আছে। ভীষণ চমকে উঠলুম। ভুল দেখছি না তো?

ও এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। মনে হল, কিছু খুঁজছে। তারপর পা বাড়াল। বুঝলুম, ওদের জেরা শেষ করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। হয়তো দিব্যকেই শুধু আটকে রেখেছে। রত্না কি পানজাবিটা খুঁজতেই এসেছে? ও কীভাবে জানল যে পানজাবিটা এখানেই লুকানো আছে! একটু পরেই বুঝলুম, পানজাবিটা কোথায় আছে, রত্না জানে না। কারণ সে ওটার পাশ দিয়ে ঘোরাঘুরি করল। তারপর আরও নীচে নামতে থাকল। মিনিট পাঁচেক পরে সে ঘুরল এবং সোজা আমার দিকে ওঠা শুরু করল। আমি একটু সরে বসলুম। কিন্তু সে সোজাসুজি উঠে এসে যেই ডানদিকে ঘুরেছে, আমার মধ্যে হঠকারী ঝোঁক এসে গেল। কর্ণেলের নিষেধ ভুলে গেলুম। আসলে আমার মধ্যে গোয়েন্দাসুলভ কৌতূহলের তাগিদ চাগিয়ে উঠেছিল সম্ভবত। আমি গম্ভীর স্বরে ডেকে উঠলুম—মিস চ্যাটার্জি!

রত্না ভীষণ চমকে গেল। তারপর অপ্রস্তুত হেসে বলল—এই মানে···একটু ঘু-ঘুরতে বেরিয়েছি। আপনি কী করছেন? নিশ্চয় আমার মতো ঘুরতে?

খুবই গোমড়ামুখে বললুম—মোটেও না। অন ডিউটিতে আছি।

রত্না হাসবার চেষ্টা করে বলল—তাই বুঝি? আচ্ছা চলি।

—মিস চ্যাটার্জি, শুনুন!

রত্না দাঁড়াল। সে ভীষণ ঘামছে। ঠোঁট কাঁপছে। মনে হল, ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলবে এক্ষুনি। তারপর অতিকষ্টে বলল—বলুন।

—কী খুঁজতে এসেছেন?

—দাদার পানজাবিটা।

—কীভাবে জানলেন যে আপনার দাদার পানজাবিটা এখানে কোনো আছে?

—আমি পানজাবি-পরা দাদাকে দেখতে পেয়েছিলুম দীপ্তির কাছে।

—চোপরাও দেখেছিল। যাক্ গে, ওটা দিয়ে কী হবে এখন? আপনার দাদার বিরুদ্ধে তো অন্য সব প্রমাণ আছে।

—না কিছু নেই। শুধু এটা ছাড়া। ...বলে রত্না হু হু করে কেঁদে উঠল।

একটু পরে বললুম—আপনি এত সহজে ভেঙে পড়তে পারেন। অথচ পুলিশের রেকর্ডে আছে, আপনি নাকি আন্তর্জাতিক টেররিস্ট দলের মেম্বার।

রত্না ফোঁস করে উঠল—একসময় ছিলুম। এখন আর নেই।

এই সময় চোখে পড়ল ওপরের দিকে ঝোপের কাছ থেকে কর্নেলের টাকওয়ালা মুণ্ডুটা দেখা যাচ্ছে। তখনি রত্নাকে চুপ করতে এবং সরে যেতে ইশারা করলুম। কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে ততক্ষণে। কর্নেল গুম হয়ে গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছেন—রত্নাও দেখতে পেল। কাছে এসে কর্নেল হঠাৎ দুজনকে টেনে বসিয়ে দিলেন এবং ফিস ফিস করে বললেন—চুপ!

পানজাবির কথা ভুলেই গিয়েছিলুম, অর্থাৎ ওদিকে এতক্ষণ চোখ ছিল না। এবার দেখি, ওখানে রণধীর চোপরা বসে রয়েছে। হতভম্ব হয়ে গেলুম। সে ব্যস্তভাবে পানজাবির পকেট হাতড়াচ্ছিল। রত্না

হিস হিস করে উঠল—বাস্টার্ড!

মেয়েদের মুখে বাস্টার্ড শুনে আমার হাসি পেল।

তারপর কর্ণেল আচমকা উঠে বিকট গর্জন করলেন—চোপরা নড়ো না! নড়লেই গুলি করব।

চোপরার দুপাশের ঝোপ ও পাথরের আড়াল থেকে ততক্ষ‍ে কয়েকজন পুলিশ অফিসার উঠে দাঁড়িয়েছেন।

এর পর যা হবার তাই হল—অর্থাৎ রণধীর চোপরা চালান গেল এখন ওসব ব্যাপার কানুনের এক্তিয়ারে। তা সব দেখার জন্য এব তদারক করার জন্য সরকার যথেষ্ট লোকজন রেখেছেন। বেসরকারি গোয়েন্দা কর্ণেল নীলাদ্রি সরকারের সেখানে কোন ভূমিকা অবান্ত এবং উনি ওতে নাক গলাবেনও না। বাংলোয় আমাদের ঘরে, অর্থা যে ঘরে আমাদের থাকতে দেওয়া হয়েছে, আমি কর্ণেল সোনালি এবং তার বাবা অনিরুদ্ধ ব্যানার্জি ও মা জয়ন্তী দেবী বিকেলে চায়ের মজলিশ জমাচ্ছিলুম। দিব্য এল না। রত্না এসে বলল—দাদ চুপচাপ শুয়ে আছে।

সেটা স্বাভাবিক। বেচারা ভীষণ আঘাত পেয়েছে মনে।

সবার চোখে মুখে কৌতূহল ফুটে উঠেছিল। সুতরাং মুখপাত্র হ‍ে আমিই প্রথম প্রশ্নটি তুললুম। কর্ণেল, চোপরা সবুজ পানজাবিতে কি খুঁজতে গিয়েছিল?

কর্ণেল একটু হেসে জবাব দিলেন—দীপ্তির হাতের মুঠোয় এক টুকরো কাগজ ছিল। খুন করার পর চোপরা সম্ভবত তাড়াতাড়িতে সেটা পকেটে ঢুকিয়েছিল। তখন তো ওর নার্ভাস অবস্থা। ক‍ে দেখে ফেলবে এই আতঙ্ক রয়েছে। তাই পানজাবি রেখে পালাবা‍ সময় কাগজটা বের করে নেয় নি। ভেবেছিল, পরে এসে নেবে এমন না হলে পানজাবিটা সে প্রকাশ্যে কোথাও ফেলে রাখত। কার‍ তার উদ্দেশ্য দিব্যের কাঁধে দায়টা চাপানো। আসলে খুন করার প‍

খুনীর খানিকটা হতবুদ্ধি অবস্থা থাকে বলেই তাদের ধরা সম্ভব হয়। কোন না কোন ক্ষেত্রে একটু ভুল করবেই। আজ পর্যন্ত আমি এমন খুনী দেখি নি, যে কোন ভুল করে নি, অর্থাৎ কোন ক্লু রাখে নি!

অনিরুদ্ধ বললেন—কাগজটাতে কী ছিল? দীপ্তি তা পেল কোথায়?

—বিশেষ কিছুই ছিল না। ছিল তিনটে জিরো লেখা। এটা একটা বিদেশী শত্রুরাষ্ট্রের দেশীয় গুপ্তচর এজেন্সির সাংকেতিক নাম। চোপরাকে তারাই মিঃ ব্যানার্জির পি. এ. করে পাঠাতে পেরেছিল।

অনিরুদ্ধ বাবু কিছু বলতে ঠোঁট ফাঁক করলেন। কর্ণেল বাধা দিয়ে বললেন—জানি, আপনার দোষ নেই। আপনি কী করতে পারেন? যাক গে, যা বলছিলুম। হতভাগিনী দীপ্তি তার বোকামির জন্যই কিন্তু খুন হল। ও যেভাবেই হোক জানতে পেরেছিল যে চোপরা থ্রি জিরো দলের মেম্বার। কিন্তু কথাটা সরাসরি অনিরুদ্ধ বাবুর কানে তুলতে পারত। তা না করে সে সম্ভবত চোপরাকে নিয়ে একটু মজা করতে চেয়েছিল। সে বোঝেই নি চোপরা যে দলের মেম্বার, তাদের সঙ্গে রসিকতা করার পরিণাম বড় সংঘাতিক।

রত্না বলে উঠল—আমার মনে পড়েছে! দীপ্তি চোপরাকে দেখলেই বলত কী মশাই, তিন শূন্যের অঙ্ক মিলল? চোপরার মুখটা কেমন সাদা হয়ে যেত যেন।

তা শুনে সোনালীও বলে উঠল—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমিও শুনেছি। ভাবতুম, নিছক জোক করছে।

কর্ণেল বললেন—চোপরা ভেবেছিল, দীপ্তির মুঠোর কাগজটা সত্যি সত্যি কোন সাংঘাতিক দলিল—হয়তো কোন সূত্রে দীপ্তির হাতে এসেছে। অদৃশ্য কালিতে নিশ্চয় কিছু লেখাটেখা আছে। কারণ তিনটে জিরো কোন কাগজে দেখলেই তাকে সতর্ক হতে হবে। দীপ্তি সত্যি বড় বোকামি করেছে। তবে একটা কথা ঠিক যে ও হাতের মুঠোয় কাগজটা না রাখলেও চোপরা তাকে খুন করত। কারণ

হত্যার পরিকল্পনাটা সেই মন্দিরে যাবার দিনই সে করে নিয়েছে। কাজেই দীপ্তিকে একদিন না একদিন খুন হতেই হত।

সোনালী বলল—কলকাতায় ট্যাক্সির ব্যাপারটা কী হল, কর্ণেল ?

কর্ণেল হাসলেন। বললেন—শুধু দীপ্তিকে ফলো করা হচ্ছিল সারাক্ষণ। চোপরার দলের লোকেরা কত তৎপর, তারই প্রমাণ ওটা। আজকালের মধ্যেই সেই ট্যাক্সি-চালক ধরা পড়ে যাবে। আরও অনেক তথ্য বেরিয়ে পড়বে। দীপ্তি মন্দিরে যাবার দিনও যথারীতি চোপরার দলের লোক ওকে ফলো করেছিল। তা না হলে চোপরা হঠাৎ গাড়ি নিয়ে মন্দিরের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকত না।

রত্না বলল—কিন্তু মন্দিরে তো দীপ্তি কারও সঙ্গে দেখা করে নি !

—ওটা সম্ভব হয় নি। কারণ, রাজীব শেরগিল তখন অলরেডি নিহত।

আমি চমকে ওঠে বললুম—বুঝতে পারছিনে কর্ণেল। রাজীব শেরগিলের সঙ্গে দীপ্তির আলাপ হল কীভাবে ? রাজীব কেন তাকে ওখানে যেতে বলবে ?

কর্ণেল জবাব দিলেন—সবটা দিব্যের মুখেই শোনা ভাল। কিন্তু সে কি এখন আসবে ?

রত্না মাথা দুলিয়ে বলল---মনে হয় না। আপনিই বলুন, কর্ণেল।

—দিব্য পরে পুলিশকে একটা লং স্টেটমেণ্ট দিয়েছে। হয়তো চেপেই যেত সব। কিন্তু তারই পাঞ্জাবি চুরি করে চোপরা তার ঘাড়ে খুনের দায় চাপাতে চেয়েছিল। এতে ওর ভীষণ রাগ হয়ে গেছে। তাই সব বলে দিয়েছে। সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলি। ...চোপরার সঙ্গে যেদিন একটা রেস্তোঁরায় তার মারামারি হয়—না, ভুল বলছি, প্রকৃতপক্ষে মারামারি হয় নি—হবার উপক্রম হয়েছিল এবং রাজীব সেটা থামিয়ে দেয়, সেদিন কিন্তু দীপ্তিও সেখানে উপস্থিত ছিল। চোপরার সঙ্গে আগে থেকেই দীপ্তি ওখানে গিয়েছিল। ইদানীং ওরা ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল, তোমরা তা জানো। যাই হোক, স্টেশন

থেকে রাজীবকে নিয়ে দিব্য দৈবাৎ ওখানে ঢোকে। বলাবাহুল্য, দীপ্তিকে চোপরার সঙ্গে দেখে মনে মনে জ্বলে ওঠে। সুযোগ খোঁজে চোপরাকে পিটুনি দেবার।

চোপরার ভঙ্গীতে আমি গম্ভীর মুখে বলে উঠলুম—থ্যাটস ন্যাচারাল।

কেউ তাতে হাসল না। কর্ণেল ছাড়া। কর্ণেল বললেন—থ্যাটস রাইট। তা, দিব্যও ঠিক রত্না বা সোনালীর মতো দীপ্তিকে 'কী মশাই, জিরো জিরোর অঙ্ক মিলল?' —চোপরার উদ্দেশ্যে এই জোক করতে শুনেছে। সেদিন ওখানে দীপ্তি মারামারি থামাতে বলে ওঠে—'এই থ্রি জিরোটিকে নিয়ে আর পারা যায় না।' দিব্য লক্ষ্য করে নি—কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি রাজীব শেরগিল খুবই চমকে উঠেছিল। সে থ্রি জিরো দলের লোক। কিন্তু কোন কারণে সম্ভবত দলের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েই হোক, অথবা নিছক অর্থের লোভে রানীডিহি এসেছিল। অর্থাৎ চোপরাকে ব্ল্যাকমেল করতে অথবা প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে অয়েল ডিরেকটারের কানে সব তুলে দিতে। আমার ধারণা, চোপরাকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে সে অনিরুদ্ধবাবুর কাছে সব ফাঁস করতে চেয়েছিল। যাইহোক, রাজীব বা দীপ্তি এখন বেঁচে নেই। কিন্তু দীপ্তির ঘরে একটা চিঠি পুলিশ আবিষ্কার করেছে। রাজীব শেরগিলের হাতের লেখার সঙ্গে মিলে যায়। নীচে নামের বদলে তিনটে জিরো নেই অনিরুদ্ধ বাবুকে লেখা সেই চিঠির মতো। সোজা নামসই রয়েছে চিঠিতে। বলাবাহুল্য ইংরাজীতে লেখা: '...থ্রি জিরোর রহস্য কি জানেন? না জানা থাকলে ১৩ তারিখে সকাল নটায় পাতালকালীর মন্দিরে আসুন।' কিন্তু দীপ্তি একা যেতে সাহস করে নি। রত্নার বুদ্ধি ও সাহসে তার আস্থা ছিল সম্ভবত! তাই রত্নাকেই সঙ্গে নেয়। দীপ্তি জানত না যে ট্যাঙ্কের কাছে পাওয়া লাশটা রাজীবের।

সোনালী বলল—ওদিন আমার একটু জ্বর মতো হয়েছিল।

—আনলাকি থার্টিন। নিহত রাজীবের কাছে ওই দিনকার দিল্লীর রিজার্ভেশন টিকিট পাওয়া গেছে। তার মানে, দীপ্তির সঙ্গে দেখা করে এবং সম্ভবত সদুপদেশ দিয়ে সে নিরাপদে দিল্লী চলে যাবে ভেবেছিল। সদুপদেশ দেবার কারণ, দিব্য তাকে বলেছিল যে দীপ্তির সঙ্গে তার বিয়ের কথা ছিল। কিন্তু বিয়েটা আর করা যাবে না। তখন রাজীব বলে, আমি বুঝিয়ে বলব। তুমি ভেবো না। চোপরাকে আমি চিনি। ও খুব খারাপ লোক। দীপ্তিকে সতর্ক করা দরকার। চোপরার হালহদিশ সব ওকে বাৎলে দিয়ে যাবো।

এতক্ষণে জয়ন্তীদেবী মুখ খুলে বললেন—এত সব কাণ্ড ভেতর-ভেতর

কর্ণেল বললেন—হ্যাঁ। এ খুব জটিল কেস। কিন্তু খুনের প্রসঙ্গে এলে বলব, এত সহজ এমন চমৎকার মডাস অপারেণ্ডি খুব কমই দেখেছি। আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, চোপরা পুবের রাস্তায় গিয়ে বাগান হয়ে এই বাংলোর পূর্ব-উত্তর কোণে দিব্যের ঘরে ঢোকে এবং সবুজ পানজাবিটা নিয়ে চলে যায়। চোখে পড়ে শুধু পরিচারিকার। তার চোখে না পড়লেও চোপরাকে আমরা ধরে ফেলতুম। সে পানজাবি গায়ে দিয়ে ঘটনাস্থলে যায়। তারপর কী ঘটেছে, তাও দেখতে পাচ্ছি। সে দীপ্তিকে বলছে—তোমার ছুরিটা খসে যাচ্ছে যে! ঠিক করে দিই। তারপর…থাক। বড় বীভৎস দৃশ্য!

রত্না আস্তে বলল—আমি ওকে দেখে দাদা ভেবেছিলুম!

কর্ণেল বললেন—দিব্যও দেখতে পেয়েছিল। সবুজ পানজাবিটা তার মনে কিছুটা সন্দেহ জাগিয়েছিল—কিন্তু জড়িয়ে পড়ার ভয়ে সে চুপ করে গিয়েছিল।

বললুম—সব তো বুঝলুম! কিন্তু লরেন্স অফ এ্যারাবিয়া?

কর্ণেল চুরুট বের করে বললেন—ওই পাতায় একটা সাবোটাজের বিবরণ আছে। অনিরুদ্ধবাবুকে সাবোটাজের ভয়াবহতা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিল রাজীব।

অনিরুদ্ধ শিউরে উঠে শুধু বললেন—হ্যাঁ।

দ্বিতীয় রহস্য

সেদিন কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার আমাকে দেখেই বলে উঠলেন—জয়ন্ত কি কখনও ছিপে মাছ ধরেছ ?

সবে ওঁর ইলিয়ট রোডের ফ্ল্যাটের মধ্যে পা বাড়িয়েছি, বেমক্কা এই প্রশ্ন। অবশ্য বুড়োর নানারকম অদ্ভুত-অদ্ভুত বাতিক আছে জানি, কিন্তু ওঁর মতো ছটফটে মানুষ ছিপ হাতে ফাতনার দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে বসে থাকবেন—এটা বিশ্বাস করা কঠিন। যাই হোক, ধীরে সুস্থে বসার পর বললুম—আজ কি তাহলে কোথাও ছিপ ফেলার আয়োজন করেছেন কর্ণেল ?

কর্ণেল হাসতে হাসতে ছড়া বলে উঠলেন :

'খোকন গেছে মাছ ধরতে
ক্ষীর নদীর কূলে,
ছিপ নিয়ে গেছে কোলাব্যাং
মাছ নিয়ে গেছে চিলে।'

অবাক হয়ে বললুম—আপনি নিশ্চয় ছেলেবেলায় বাংলা পড়েন নি। এ ছড়া কোথায় শিখলেন ?

কর্ণেল জবাব দিলেন—আমার এক ভাগ্নীর মেয়ের কাছে। ছড়াটা কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট ! অপূর্ব ! ভাবা যায় না ! বেচারা খোকন বড় সাধে মাছ ধরতে বসেছে। এদিকে কিনা দুষ্টু কোলাব্যাংটা তার ছিপখানাই নিয়ে পালাল ? ওদিকে কোত্থেকে এক ব্যাটা চিল এসে… ভাবা যায় না ! ভাবা যায় না !

কর্ণেল ছড়ায় বর্ণিত দৃশ্য যেন চোখ বুজে দেখতে দেখতে খুব মুগ্ধ

হয়ে তারিফ করতে থাকলেন এবং সেই সঙ্গে ওঁর প্রাণখোলা হাসি। মিস এ্যারাথুন পর্দার ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে থ।

বুড়োর মধ্যে খোকাটেভাব আছে, বরাবর দেখেছি। কিন্তু আজ সকালে আমাকে জরুরী তলব দিয়ে ডেকে এনে নিতান্ত মাছ ধবার প্রোগ্রাম শোনাবেন ভাবি নি। আমি খবরের কাগজের রিপোর্টার এবং এই বাষট্টি বছরের কর্ণেলটি এক ধুরন্ধর প্রাইভেট ঘুঘু, অর্থাৎ ইনভেস্টি-গেটার—সোজা কথায় গোয়েন্দা। আশা ছিল, গুরুতর একটা ক্রাইম স্টোরি পেয়ে যাব। দৈনিক সত্যসেবকের আগামীদিনের প্রথম-পাতাটা পাঠকদের মাৎ করে ফেলবে! কিন্তু এ যে দেখছি, নিতান্ত মাছধরার বদখেয়াল নিয়ে উনি বসে আছেন! আমার মতো ব্যস্ত রিপোর্টারের একটা দিনের দাম খুব চড়া। আমি হতাশ হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলুম।

হঠাৎ কর্ণেল কোণার দিকে ঘুরে বললেন—মিঃ রায়, আলাপ করিয়ে দিই। এই আমার সেই প্রিয়তম তরুণ বন্ধু জয়ন্ত—যার কথা আপনাকে বলছিলুম।

এতক্ষণ কোণার দিকে তাকাই নি। এবার দেখি, খবরের কাগজের আড়ালে এক সুদর্শন প্রৌঢ় ভদ্রলোক—উজ্জ্বল ফর্সা রঙ, পরনে নেভিব্লু আঁটো পাতলুন এবং গায়ে টকটকে লাল স্পোর্টিং গেঞ্জি, ঠোঁটে আটকানো পাইপ, মুখ বের করলেন। ভদ্রলোকের কাঁচাপাকা গোঁফে কর্ণেলের মতো একটা সামরিক জীবনের গন্ধ মেলে। উনি কাগজ ভাঁজ করে রেখে তখুনি আমাকে নমস্কার করলেন। আমিও।

কর্ণেল বললেন—জয়ন্ত, ইনি মেজর ইন্দ্রনাথ রায়। আমার সামরিক জীবনের বিশেষ স্নেহভাজন বন্ধু। সম্প্রতি রিটায়ার করছেন। এঁর জীবন খুব রোমাঞ্চকর, জয়ন্ত। সিক্সটি টুতে চীনারা নেফাবর্ডারে এঁকে ধরে নিয়ে যায়। জঘন্য অত্যাচার করে। তারপর…

ইন্দ্রনাথ হাত তুলে হাসতে হাসতে বললেন—এনাফ্‌, কর্ণেল!

আমি আপনার মতো কৃতী যোদ্ধা ছিলুম না—সুযোগও পাই নি। তাই অত কিছু বলারও নেই।

কর্ণেল আপত্তি গ্রাহ্য না করে বললেন—তাছাড়াও এঁর একটা উৎকৃষ্ট সামাজিক পরিচয় আছে, জয়ন্ত। ইনি মহিমানগরের প্রখ্যাত রাজ-পরিবারের সন্তান। মধ্যপ্রদেশের নানা জায়গায় এঁদের অনেকগুলো খনি ছিল। একটা বাদে সবই এখন রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে।

ইন্দ্রনাথ বললেন—ও একটা ডেড মাইন বলতে পারেন অবশ্য। ছেড়ে দিয়েছি আমরা।

কর্ণেল প্রশ্ন করলেন—কিসের খনি যেন ?

—সীসের। সাত বছর আগে ওটা পোড়ো হয়ে গেছে। আর কিছু মেলে নি।

—খনিমুখগুলো তাহলে নিশ্চয় সিল করে দিয়েছেন ?

—না কর্ণেল। সিল করার সুযোগ পাই নি। মানে……একটু ইতস্তত করে ইন্দ্রনাথ মৃদু হেসে ফের বললেন—আমার অবশ্য কোনরকম কুসংস্কার নেই। আপনি তা ভালই জানেন, কর্ণেল। কিন্তু আমার কাকা জগদীপ রায় হঠাৎ রহস্যজনক ভাবে মারা পড়েন—ওঁর ডেড বডি খনির একটা সুড়ঙ্গে পড়ে ছিল—তারপর কাকিমা জেদ ধরলেন, যেমন আছে তেমনি পড়ে থাক—তোমরা কেউ ওখানে যাবে না। কারণ কাকা নাকি খনিমুখগুলো কীভাবে বন্ধ করা যায়, তা ঠিক করতেই গিয়েছিলেন ওখানে। আর, আপনি তো জানেন, কাকিমাই আমাদের ফ্যামিলির একমাত্র গার্জেন—কাকার অবর্তমানে। আমাদের ছেলেবেলা থেকে উনিই মানুষ করেছেন। ওঁর কথা আমাদের দু-ভাইয়ের কাছে ঈশ্বরের আদেশ। তাই আমরা আর ওদিকে মাড়াই নি।

কর্ণেল বললেন—আপনার কাকিমার কী ধারণা হয়েছিল বলতে পারেন ?

ইন্দ্রনাথকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। বললেন—একটু খুলে না বললে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন না। কাকা ছিলেন খেয়ালী মানুষ। মাছ ধরার বাতিক ছিল প্রচণ্ড। সীসের খনিটা রয়েছে তিনদিকে তিনটে পাহাড়ের মধ্যিখানে, একটি উপত্যকায়। খনির পেছনে আছে একটা হ্রদ। আসলে ওটা একটা নদীর বাঁকের মুখে, ন্যাচারাল ওয়াটার ড্যাম। পরে মুখটা চড়া পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু হ্রদটা খুব গভীর হওয়ার জন্য জল কখনও মরে না। আমরা খনিটা ছেড়ে আসার পর নদীতে একবার প্রচণ্ড বন্যা হয়। তখন হ্রদেও জল ঢুকে পড়ে এবং সেই জল খনির মধ্যেও ঢুকে যায়। কিছু কিছু খনিমুখ এর ফলেই আপনা-আপনি ধস নেমে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাকি ছিল তিনটে খনিমুখ, একটু উঁচু জায়গায়। কাকা প্রতিবার অক্টোবরে ওখানে গিয়ে তাঁর বাংলোয় কাটাতেন। বরাবরকার অভ্যাস। জায়গাটার সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। যাই হোক, হ্রদে মাছ ধরার নেশা ছিল ওঁর। পাঁচবছর আগের অক্টোবরে কাকিমাকে নিয়ে উনি ওখানে যান। সেবারই খনিমুখ তিনটে বন্ধ করে আসার মতলব ছিল। সঙ্গে একজন ইঞ্জিনিয়ারও নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর কী হল, ফোরটিনথ অক্টোবর সারা বিকেল মাছ ধরার পর ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোককে বলেন—আপনি বাংলোয় চলুন, আমি একটু পরে যাচ্ছি। তারপর অনেক রাত হল, কিন্তু ফিরলেন না। তখন খোঁজাখুজি পড়ে গেল। হ্রদে স্থানীয় কয়েকজন আদিবাসী জেলে রাতে মাছ ধরতে এসেছিল। তাদের সঙ্গে দেখা হলে জানাল—সায়েবকে তারা খোলা খনিমুখের কাছে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বালতে দেখেছে। রাত তখন একটা। জেলেদের কথা শুনে...

কর্নেল বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—জেলেরা তো লেকে ছিল। কী ভাবে জানল, উনিই আপনার কাকা?

ইন্দ্রনাথ বললেন—নির্জন জায়গা। তাছাড়া ওখানে ভূত আছে বলে স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস। সব পোড়ো খনি কেন্দ্র করেই

ভূতুড়ে গালগল্প গড়ে ওঠে। এখানেও তাই হয়েছিল। যাইহোক, এই জেলে তিনজন ছিল খুব সাহসী। বয়সে যুবক। টর্চের আলো দেখে ওরা পরস্পর তর্ক জুড়ে দেয় যে ওটা ভূত কিংবা ভূত নয়। তাছাড়া হ্রদটায় প্রচুর মাছ—অথচ ভূতের ভয়ে গরীব জেলেরা মাছ ধরতে ভয় পায়—পাছে ভূতের অভিশাপ লাগে। কিন্তু এই তিনটি সাহসী তরুণ আদিবাসী সে-রাতে জেদ করেই এসেছিল। হ্যাঁ—রাতেই এসে এবং মাছ ধরে ওরা প্রমাণ করে দেবে যে ওখানে ভূতপ্রেত কিংবা অভিশাপ ব্যাপারটা মিথ্যে।

কর্ণেল বললেন—হুম্! তারপর?

—ওরা আলো লক্ষ্য করে ওখানে যায়। দূর থেকেই চেঁচিয়ে বলে—কে ওখানে? তখন কাকার সাড়া পায়। কাকা ওদের সুপরিচিত। ফলে, ওরা কাছে না গিয়ে হ্রদে নিজের কাজে ফিরে যায়। যাই হোক, এই সূত্র ধরে সেই খনিমুখ তিনটের কাছে যাওয়া হল। তারপর একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে কাকার লাশ পাওয়া গেল। কোন ক্ষতচিহ্ন নেই—শ্বাসরোধ করেও মারা হয় নি। পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে বলা হল—হার্টফেল করে মারা পড়েছেন। অথচ কাকার স্বাস্থ্য ছিল খুবই ভাল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর কর্ণেল বললেন—কিন্তু আপনার কাকিমা খনিমুখ বন্ধ করতে নিষেধ করেন বলছিলেন। কেন—সেটা স্পষ্ট বুঝলুম না মিঃ রায়!

ইন্দ্রনাথ আনমনে মাথা নেড়ে বললেন—কাকিমাও স্পষ্ট কিছু বলেন নি। শুধু বলেছিলেন—ওগুলো যেমন আছে, তেমনি থাক। আমার ছোট ভাই সৌমেন্দু ডাক্তার। ও এখন জব্বলপুরে সরকারী হাসপাতালের চার্জে আছে। কোন কুসংস্কার নেই। ও জেদ ধরেছিল কাকিমার কাছে। কিন্তু কাকিমা শুধু বলেছিলেন—খনিতে এক সাধু আছেন—তিনি নাকি অদৃশ্যও হতে পারেন। সেই সাধু নির্জনে তপস্যা করার জন্য খনির ভেতরে ঢুকে পড়েছেন কবে। জবর

দখল—যাকে বলে! ...কথাটা বলে ইন্দ্রনাথ হো হো. করে হেসে উঠলেন।

আমরাও হাসলুম। কর্ণেল বললেন—সাধুকে কেউ দেখেছে কখনও?

ইন্দ্রনাথ বললেন—না। আমার ধারণা, ওটা কাকিমার নিছক বিশ্বাস। তবে কেন এমন আজগুবি ধারণা হল, তাও উনি বলেন নি। বলবেনও না। খনিমুখ বন্ধ করলে সাধু নাকি রেগে যাবেন।

মিস এ্যারাথুন ট্রেতে কফি নিয়ে এল। আমরা কিছুক্ষণ কফি খেলুম চুপচাপ। তারপর কর্ণেল চুরুট জ্বেলে বললেন—হুম্! খুব ইণ্টারেস্টিং!

ইন্দ্রনাথ বললেন—তবে কর্ণেল, ওই ভূতুড়ে রহস্য ফাঁস করার জন্যে আমি নিশ্চয় আপনার কাছে আসি নি। আমি এসেছি, স্রেফ মাছ ধরার প্রস্তাব নিয়ে। অবশ্য, আপনারই কাছে প্রস্তাব আনার কারণ যদি জানতে চান, তাহলে বলব—কাকার মৃত্যুর পর থেকে প্রতিবছরই এই সময় আমার চিরিমিরি এলাকার ওই হ্রদে যেতে ইচ্ছে করে—অন্তত স্রেফ ছিপে মাছ ধরার জন্যে। অথচ বুঝতেই পারছেন, ওই ট্রাজিক ঘটনার ফলে একটা অস্বস্তি জেগে ওঠে। দ্বিধা এসে সামনে দাঁড়ায়। একা যেতে শেষ অব্দি সাহস পাইনে। ওদিকে কাকিমা জানতে পারলেও বাধা দেবেন। তাই অবশেষে আপনাকে নিয়ে যাবার প্ল্যান মাথায় এসে গেল। আপনারও মাছ ধরার হবি ছিল এক সময়—দেখেছি।

কর্ণেল মাথা দুলিয়ে বললেন—হুম। ছিল! এখন সেটা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে মিঃ রায়। কিন্তু একটা কথা—আপনার কাকিমা আপনাকে বাধা দেবেন না?

ইন্দ্রনাথ বললেন—নিশ্চয় দেবেন। কিন্তু আমি এবার যেভাবে হোক, যাবই কর্ণেল। জায়গাটা এত সুন্দর, এত নির্জন, ভাবা যায় না। আমার স্মৃতি আমাকে উত্ত্যক্ত করে মারছে। কাকিমাকে গোপন করেই যাব।

কর্ণেল আমার দিকে ঘুরে বললেন—ডার্লিং জয়ন্ত! আশা করি, ইতিমধ্যে তুমি চঞ্চল হয়ে উঠেছ! মনশ্চক্ষে চিরিমিরি হ্রদের অপূর্ব সৌন্দর্য এবং রূপোলী মৎস্য অবলোকন করছ!

কর্ণেল মাঝে মাঝে চমৎকার সংস্কৃতবহুল বাংলা বলে ওঠেন। অথচ ওঁর শিক্ষাদীক্ষা সবই লণ্ডনে। অবশ্য ওঁর বাবা ছিলেন ইংরেজ, মা বাঙালী। কর্ণেল নিঃসকোচে জানিয়েছিলেন—ওঁর মা সুন্দরবন এলাকার নিম্নবর্ণীয় সম্প্রদায়ের মেয়ে। ওঁর দাদামশাই ছিলেন সেই ইংরেজ পরিবারেরই বাজার সরকার। সেই সরকার পদবীটি উনি ছাড়েন নি। নীলাদ্রি নামটা ওঁর মায়ের দেওয়া। মাকে বাংলা ও সংস্কৃত পড়িয়েছিলেন এক বাঙালী পণ্ডিত—ইংরেজি শেখাতেন এক আইরিশ গভর্ণেস। কর্ণেলের বাবা হেনরি উডসওয়ার্থ অতিমাত্রায় উদারচেতা ইংরেজ সিভিলিয়ান ছিলেন। আমি একবার এক চিঠিতে কর্ণেলকে কর্ণেল নীলাদ্রি উডসওয়ার্থ লেখায় কর্ণেল খুব বিচলিত হয়ে ওঠেন। জবাবে লেখেন—ডার্লিং জয়ন্ত, পৈতৃক নাম সন্তানের পক্ষে খুবই সম্মানজনক এবং গর্বের বিষয়। কিন্তু আমি বরাবর আমার মায়ের পারিবারিক পদবী ধারণ করেই খুশি থাকতে চাই।

অনেক পরে এর কারণ জানতে পেরেছিলুম।

হেনরি উডসওয়ার্থ স্ত্রীকে শেষ জীবনে ত্যাগ করেন। তখন উনি লণ্ডনে। কর্ণেলের বয়স তখন বারো বছর। তাঁকে নিয়ে ভারতে ফিরে আসেন মিসেস অনিমা। পরের বছর হেনরি মারা যান। আশ্চর্য, পরিত্যক্তা স্ত্রী এবং ছেলের নামে তিনি প্রচুর সম্পত্তি দিয়ে যান। কর্ণেলের মা তার একপয়সাও কিন্তু নেন নি। দান করে দেন একটা জনকল্যাণ সংস্থায়। আয়ার কাজ করে ছেলেকে মানুষ করে তোলেন।

মাঝে মাঝে কর্ণেলের মুখে যেন সেই বিষাদময় দিনগুলোর স্মৃতি

ছাপ ফেলে। চুপচাপ বসে থাকেন! বড্ড মায়া হয় লোকটার ওপর। আমি ডাকলে চমকে উঠে বলেন—কিছু বলছ জয়ন্ত?

বলি—কী ভাবছেন?

মাথা দোলান বৃদ্ধ। মুখে শিশুর হাসি। —ও কিছু না, ডার্লিং। নাথিং।

তখন বিশ্বাস করা কঠিন যে এই মানুষটি বীরবিক্রমে একদা ফ্রন্টে লড়াই করেছেন—সারা গায়ে গুলির ক্ষতচিহ্ন আছে। এখনও বাঘা-বাঘা খুনী বা মহাবলী অপরাধী ওঁর চোখের দিকে তাকালেই নার্ভাস হয়ে পড়ে। মগজে কম্পিউটার নিয়ে উনি সব রহস্যের গাণিতিক সমাধান করতে সতত তৎপর! এই বয়সেও পাহাড়জঙ্গল ভেঙে বিরল জাতের পাখি বা প্রজাপতি পোকা-মাকড় দেখতে ছোটাছুটি করেন। চোখে না দেখলে অবিশ্বাস্য ভাবতুম এই আশ্চর্য চরিত্রটিকে।……

আমার এই চিন্তার ছাপ মুখে পড়েছিল নিশ্চয়—কর্ণেল মিটিমিটি হেসে বলে উঠলেন—কী জয়ন্ত? তুমি নিশ্চয় ভাবছ—এই বৃদ্ধ আসলে মাছের লোভ দেখিয়ে তোমায় হয়তো মিঃ জগদীপ রায়ের মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটনে বিড়ম্বিত করবে! না ডার্লিং, তা মোটেও না। আর রহস্যে-টহস্যে আমার মতি নেই। এনাফ অফ ইট। এবার আমরা দুজনে নিছক ছিপ ফেলে নির্জনে ধ্যানস্থ হতেই রওনা দেব।

ইন্দ্রনাথ বললেন দুজন নয় কর্ণেল, তিনজন। আমাকে ভুলে যাচ্ছেন যে!

কর্ণেল হেসে বললেন—রাইট, রাইট। তারপর অস্ফুটস্বরে বাচ্চা ছেলের মতো সেই ছড়াটা আওড়াতে থাকলেন:

খোকন গেছে মাছ ধরতে
ক্ষীর নদীর কূলে…

চিরিমিরি পাহাড়ের বাংলোটির নাম 'দি সোয়ান।' দূর থেকে

ধূসর ওই পুরনো বাংলোটিকে সত্যি একটা রাজহাঁসের মতো দেখায়---যেন মাঝেমাঝে রাজহাঁসটা জ্যোৎস্নারাতে হ্রদে সাঁতার কেটেও যায়। বাংলোর গেট থেকে একফালি সরু পথ ঘুরে ঘুরে হ্রদে নেমেছে। যেখানে নেমেছে, সেখানে কয়েক ধাপ পাথর বাঁধানো আছে ঘাটের মতো। পথের দুধারে গাছপালা ঝোপঝাড় আছে। পথটাও এবড়োখেবড়ো অব্যবহৃত হয়ে রয়েছে অনেক বছর। ফাটলে ঘাস বা আগাছা গজিয়েছে। আমরা দুপুর নাগাদ তিনজনে পৌঁছলে কেয়ার-টেকার রঘুবীর সিং তক্ষুণি কয়েকজন আদিবাসী লাগিয়ে সব সাফ করার ব্যবস্থা করল। ঘাটের পাথরগুলোয় শ্যাওলা জমে ছিল। তাও সাফ করা হল। লাঞ্চের আগে কর্ণেল স্বভাবমতো চারপাশটা দেখতে বেরিয়ে গেলেন—একা। সঙ্গে বাইনাকুলার আর ক্যামেরা নিতেও ভুললেন না। আমাকে ডাকলেন না দেখে অভিমান হল—অবশ্য ডাকলেও যেতুম না, সারাদিন সারারাত ট্রেনজার্ণির পর তখন খুব ক্লান্ত আমি। বিছানায় গড়াচ্ছি। কর্ণেলকে ইন্দ্রনাথ সাবধান করে দিলেন—এলাকার জঙ্গলে বুনো হাতি আছে অজস্র। বাঘ ভালুকও কম নেই। কর্ণেল ঘাড় নাড়লেন মাত্র।

বাংলোর ঘরগুলো এসেই দেখা হয়েছে। পাঁচখানা ঘর আছে। একটা কিচেন-কাম-ডাইনিং প্লাস ড্রয়িং রুম, একটা বাথরুম-প্রিভি, বাকি তিনটে শোবার ঘর। থাকার ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি নেই। ইন্দ্রনাথ খবর পাঠিয়ে সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। দান সিং নামে ওঁদের পুরনো রাঁধুনীও অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। এবার সে কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে কাজে লেগে গেল। আমাদের সঙ্গে তিনখানা হাল্কা মজবুত বিলিতি ছিপ, চার এবং আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র রয়েছে। ইন্দ্রনাথ আমাকে ছিপ ফেলার ঘাট দেখতে ডাকলেন একবার। কিন্তু আমার ক্লান্তি লক্ষ্য করে শেষে একজন লোক সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন।

একটু পরে বারান্দায় গিয়ে চারপাশের সৌন্দর্য দেখতে থাকলুম।

হ্রদটা বিশাল। সামনে উত্তরে রয়েছে সেটা। পশ্চিমে মোটামুটি সমতল জায়গায় ওঁদের পোড়ো খনি—এখন জঙ্গল গজিয়ে গেছে। পূবে এবং উত্তরে যতদূর চোখ যায়, শুধু জল। দিগন্তরেখায় কিছু নীল পাহাড়। উত্তরেও পাহাড়—সেগুলো কাছে বলে মনে হল। বাংলোটা রয়েছে পাহাড়ের গায়ে—এটা হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ-ঘেঁসা। রঘুবীর এসে সব দেখাল। বাংলোর পিছনে আরেকটা রাস্তা আছে—সেটা চলে গেছে খনিতে। বাংলো থেকে সিকি কিলোমিটার দূরে রাস্তাটা দুভাগ হয়েছে—ডাইনে চলে গেছে খনির দিকে। বাঁয়ে গিয়ে মিলেছে একটা ঢালু বড় সড়কে—মাইল পাঁচেক দূরে। ওই পথেই আমরা টাঙ্গায় চেপে এসেছি। সড়কটা নদী পেরিয়ে পূবে বরটুঙ্গা স্টেশন হয়ে জব্বলপুরের দিকে চলে গেছে।

রঘুবীর বলল—কী ছিল জায়গাটা, কী হয়ে গেল! কত লোকজন—কত আওয়াজ—সবসময় গমগম করত। আমি স্যার, সেই এসেছিলুম রায়সাহেবের সঙ্গে পাঁচ সাল আগে। উনি তো মারা গেলেন। তারপর আমিও চলে গেলুম। আমার মনে বড্ড কষ্ট হত স্যার। কিন্তু ওনারা ছাড়বেন না। বাংলোর জিম্মাদারি করতে হবে। তো আমার ছেলেই এখানে এসে মাঝে মাঝে দেখাশোনা করে যেত। খুব সাহসী ছেলে স্যার! আমার তো এ বয়সে এই ভূতের আড্ডায় থাকার সাহসই ছিল না। লেকিন দেখুন, আমার ছেলের একচুল ক্ষতি হয় নি। ভূতও নাকি দেখা দেয় নি। তবে…

ও থামলে জিগ্যেস করলুম—তবে?

—ছেলে বলত, খনির ওদিকে আলো জ্বলতে দেখেছে। ওর ধারণা ওসব আলো জেলেদের। রাতে মাছ ধরতে আসে জেলেরা।

—আচ্ছা রঘুবীর, রায়সাহেব মারা যাবার সময় তো তুমি এখানে ছিলে?

—জী হুজুর।

—তুমি কি মনে করো উনি হার্টফেল করেই মারা যান?

রঘু গম্ভীর হয়ে বলল—জী হ্যাঁ। আচানক কিছু আজগুবি দেখলে তো হার্টফেল করবেই! আমার মালুম, রায়সাহেব সেই সাধুকে দেখতে পেয়েছিলেন। সাধুর রাগ হয়েছিল। কেন? না—খনির গর্ত বন্ধ করে দেবেন রায়সাহেব। সাধুর ভয়ঙ্কর চেহারা দেখেই মারা যান উনি।

—তাহলে বলছ, খনির মধ্যে কোন সাধু ছিলেন? তাঁকে কেউ দেখেছিল নাকি?

—জী হ্যাঁ। মাইজি দেখেছিলেন।

—তুমি?

রঘুবীর একটু চুপ করে থেকে বলল—স্যার, বিশ্বাস করেন তো বলি। আমি একদিন সন্ধ্যাবেলায় এক পলকের জন্যে দেখেছিলুম। আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন। তারপর—আর নেই! বিলকুল হাওয়া।

—বল কী রঘুবীর!

—হ্যাঁ স্যার। দেখামাত্র গর্তে সেঁধিয়ে গেলেন।

মনে মনে হেসে সিগ্রেট ধরালুম। রঘুবীর হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে চলে গেল। একটু পরে শুনি বাংলোর পিছন দিকে গাড়ির আওয়াজ হচ্ছে। ব্যাপারটা দেখার জন্য লন ঘুরে পিছনে যেতেই দেখলুম, একটা জিপ থেকে আমার বয়সী একজন যুবক নামল—চোখে সানগ্লাস, পিঠে বন্দুক। তারপর নামলেন এক বুড়ো। কর্ণেলের বয়সী। তবে কর্ণেলের মতো টাক বা দাড়ি নেই। শেষে নামলেন এক বৃদ্ধা ভদ্র-মহিলা। পোশাক দেখেই চমকে উঠলুম। বাঙালী বিধবা। তাহলে কি হঠাৎ ইন্দ্রনাথের সেই কাকিমা এসে পড়লেন? সর্বনাশ!

কিন্তু এই অভিশপ্ত মাটিতে হঠাৎ উনি নিজেই এসে পড়লেন এবং সদলবলে—কেন?

ততক্ষণে রঘুবীর দৌড়ে হাজির হয়েছে। তার হাবভাব দেখে স্পষ্ট জানা গেল, যা ভেবেছি, তাই। বৃদ্ধা বেশ শক্ত সমর্থ মনে হল।

আমাকে দেখে ভুরু কুঁচকে তাকালেন। তারপর প্রশ্ন করলেন—আপনাকে তো চিনলুম না বাবা?

রঘুবীর বলল—মাইজী, ওনারা এসেছেন কলকাতা থেকে। ইন্দর সাহেবের সঙ্গে। লেকে মাছ ধরবেন।

—ইন্দ্র! ইন্দ্র এসেছে? বৃদ্ধার মুখে খুবই বিস্ময় ফুটে উঠল।

—জী হ্যাঁ। এই তো দো-তিনঘণ্টা আগে এসেছেন। ঔর এক বুড়ো কর্ণেল সাহেব এসেছেন।

বৃদ্ধা গম্ভীর মুখে দলবল সহ বাংলোয় উঠলেন। ব্যাপারটা আমার খারাপ লাগল। ভুতুড়ে বাংলোর সব রোমান্স মাঠে মারা যাবে। বেশি হইচই করা যাবে না। মেপে জুপে চলাফেরা করতে হবে। ইন্দ্রনাথের মুখে ওদের গার্জেন এই ভদ্রমহিলার যে ব্যক্তিত্বের আঁচ পেয়েছিলুম, বাস্তবে মনে হচ্ছে তার চেয়েও কড়া কিছু। আশঙ্কাও হল, ইন্দ্রনাথ ওঁর বিনা অনুমতিতে এবং অজ্ঞাতসারে আমদের নিয়ে এখানে এসেছেন—এই নিয়ে কোন মনান্তর দেখা দেবে না তো?

অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে গেট পেরিয়ে রাস্তায় গেলুম। তারপর আরও কিছু এগিয়ে যেতেই আচমকা পাশের একটা ঝোপ ঠেলে বেরিয়ে এলেন কর্ণেল। টাকে মাকড়সার জাল, জামায় কাঁটা আটকে আছে এবং শুকনো পাতা লেগে রয়েছে। আমাকে দেখে যেন একটু অপ্রস্তুত হলেন। বললেন—এই যে জয়ন্ত!

বললুম—বন্য জন্তুর মতো ঝোপ জঙ্গলে ঢুঁ মেরে বেড়াচ্ছেন। ওঁদিকে দেখুন গে, ধুন্ধুমার শুরু হয়েছে এতক্ষণ। ইন্দ্রনাথের সেই কাকিমা ভদ্রমহিলা দলবল নিয়ে এসে পড়েছেন!

কর্ণেল হাত তুলে বললেন—দেখেছি বৎস। এতে নার্ভাস হয়ে পড়ার কিছু নেই। এবার চুপচাপ একটা জমাটি নাটক দেখতে থাকো। আনন্দ পাবে—আই এ্যাসিওর ইউ, ডার্লিং!

—নাটক মানে?

কর্ণেল টাক চুলকে বললেন—হ্যাঁ জয়ন্ত। সম্ভবত একটা

রোমাঞ্চকর নাটকের শেষ অঙ্কের পর্দা উঠল এবং আমরা কিছু না জেনে তার মধ্যে ঢুকে পড়েছি।

বিস্মিত হয়ে বললুম—কর্ণেল ! প্লীজ—অন্ধকারে রাখবেন না !

কর্ণেল সস্নেহে আমার একটা হাত ধরে বললেন—ধৈর্য ধরো, জয়ন্ত। সম্ভবত আমাদের দুজনেরই এখন একটা সুবিশাল ধৈর্যের মধ্যে সময় কাটাতে হবে। আই জাস্ট স্মেল !

লাঞ্চ খেতে তিনটে বেজে গেল। আশ্বস্ত হয়ে দেখলুম, ইন্দ্রনাথের ঠাণ্ডা ধরনের নির্লিপ্ত আচরণ সত্ত্বেও তাঁর কাকিমা সর্বেশ্বরী দেবী আমাদের—বিশেষ করে কর্ণেলের প্রতি খুব ভদ্রতা দেখালেন। কিন্তু একটু বিসদৃশ মনে হল দুই ভায়ের পরস্পর আচরণ। ইন্দ্রনাথ ও সৌমেন্দু পরস্পর বাক্যালাপ পর্যন্ত করলেন না। সর্বেশ্বরীর সঙ্গের ভদ্রলোক সেই ইঞ্জিনিয়ার এবং খনি-বিশারদ, যিনি জগদীপের মৃত্যুর সময় এখানে ছিলেন এবং খনিমুখ বন্ধ করার উপায় বাংলাতে এসেছিলেন। এই বৃদ্ধের নাম অনন্তরাম শর্মা। মহীশূরের লোক। জগদীপের ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ছিলেন।

কর্ণেলের যা স্বভাব, এই তিনজন নবাগতের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তুলতে দেরী হল না। লাঞ্চের টেবিলে কর্ণেলের অনুরোধে সর্বেশ্বরীও বসলেন। কিন্তু তিনি নিরামিষ খান। আলাদা ব্যবস্থাও ছিল। নিঃসঙ্কোচে খেলেন এবং তাঁর স্বামীর কার্যকলাপ সম্পর্কে গল্পও করলেন। মনে হল, ভদ্রমহিলার প্রভুত্ব করার ক্ষমতা অসাধারণ এবং রীতিমতো শিক্ষাদীক্ষা আছে।

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে ইন্দ্রনাথ তিনটে ছিপ নিয়ে চলে গেলেন হ্রদের দিকে। আমাদের দুজনকে ডেকেও গেলেন। কর্ণেল বললেন—খাওয়ার পর আধঘণ্টা জিরিয়ে নেওয়া আমার অভ্যাস, মিস্টার রায়। আপনি চলুন, আমরা দুজনে যাচ্ছি।

বুঝলাম, আমাকেও কর্ণেলের সঙ্গে জিরিয়ে নিতে হবে।

সৌমেন্দুকে দেখলুম লনে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট

খাচ্ছেন। বারান্দার চেয়ারে আমরা চারজন বসে আছি—কর্ণেল, সর্বেশ্বরী, মিঃ শর্মা আর আমি। সর্বেশ্বরী বলছিলেন—তা বুঝলেন কর্ণেল, স্বপ্ন দেখার পর তো আমি অস্থির হয়ে উঠলুম। তখনই টেলি করে দিলুম মিঃ শর্মাকে। সৌমেন্দুকেও খবর দিলুম মিঃ শর্মাকে নিয়ে সে যেন অপেক্ষা করে। তারপর···

কর্ণেল বাধা দিয়ে বললেন—একটা ছোট্ট প্রশ্ন মিসেস রায়। জ্যাস্ট একটা কৌতূহল। ইন্দ্রনাথকে আপনি কথাটা নিশ্চয় জানান নি?

সর্বেশ্বরী গম্ভীর হয়ে জবাব দিলেন—দেখুন কর্ণেল সরকার, ব্যাপারটা অবশ্য পারিবারিক এবং প্রাইভেট এ্যাফেয়ার। কিন্তু আপনাকে বলতে সংকোচের কারণ দেখি না। ইন্দ্রনাথকেই প্রথমে কথাটা বললুম। কিন্তু ও বরাবর অবিশ্বাসী-নাস্তিক। ও উড়িয়ে দিল। বলল—একটা পোড়ো খনির গর্ত বুজিয়ে ফেলতে একগাদা টাকা খরচা হবে। এর কোন জাস্টিফিকেশন নেই। ইন্দ্রনাথ গোঁ ধরে বসে রইল। তখন আর কী করি বলুন? প্রত্যক্ষ স্বপ্নে দেখলুম—উনি বলছেন পিট তিনটে শিগগির বন্ধ করে দাও। সাধুবাবা চলে গেছেন!

কর্ণেল মাথা দুলিয়ে সায় দিলেন।—রাইট, রাইট মিসেস রায়। কিন্তু—ইয়ে, মানে মিঃ শর্মাকে জিজ্ঞেস করছি। মিঃ শর্মা! কীভাবে পিট বন্ধ করবেন, নিশ্চয় প্ল্যান করেই এসেছেন?

শর্মা বললেন—অবশ্যই। সঙ্গে ডিনামাইট নিয়ে এসেছি। কোন অসুবিধে হবে না। এখন আগে একবার গিয়ে জায়গাটা দেখতে হবে—কী অবস্থায় আছে। পাঁচ বছর আগে যেমন দেখেছি, তেমন না থাকতেও পারে। কারণ, বুঝতেই পারছেন—প্রকৃতি সবসময় নিজের কাজ করে যাচ্ছে। ওলট-পালট ঘটাচ্ছে।...বলে শর্মা হাসতে থাকলেন।

কর্ণেল ফের মাথা দুলিয়ে বললেন—রাইট, রাইট।

শর্মা একটু ঝুঁকে বললেন—কিছু যদি মনে না করেন কর্ণেল, তাহলে আপনিও আমার সঙ্গে যেতে পারেন। সার্ভে করার সময় আপনার মতো অভিজ্ঞ একজন সমরকুশলী থাকা খুবই সঙ্গত। এ ধরনের কাজকর্ম সমর বিভাগের লোকেরা নিশ্চয় করে থাকেন!

কর্ণেল তক্ষুণি আমন্ত্রণটা নিলেন। আমার দিকে ঘুরে বললেন—জয়ন্ত, তাহলে তুমি ছিপ ফেলতে যাও। আমি মিঃ শর্মার সঙ্গে যাই।...

সর্বেশ্বরী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আপনারা ঘুরে আসুন। ততক্ষণ আমি বিশ্রাম করে নিই।

সর্বেশ্বরী ঘরে ঢুকলেন। কর্ণেল ও মিঃ শর্মা বেরিয়ে গেলেন। আমি লেকের দিকে পা বাড়ালুম। লন পেরিয়ে যাবার সময় সৌমেন্দু হঠাৎ আমাকে ডাকলেন—জয়ন্তবাবু, শুনুন!

কাছে গেলুম। বললুম—আপনি গেলেন না যে?

সৌমেন্দু সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন—আপনারা কি সত্যি নিছক মাছ ধরতেই এসেছেন?

চমকে উঠে বললুম—নিশ্চয়ই। আপনার অবিশ্বাসের কারণ বুঝলুম না সৌমেন্দুবাবু। দুঃখিত।

সৌমেন্দু আমার অনুযোগ গ্রাহ্য না করে প্রশ্ন করলেন—আপনি কি সত্যি রিপোর্টার?

অপমানিত বোধ করলুম। পকেট থেকে আমার পরিচিতিপত্র (ফটো-সমেত) বের করে ওঁর সামনে ধরে বললুম—আপনার কি এটা জাল মনে হচ্ছে?

সৌমেন্দু, আশ্চর্য, আইডেনটিটি কার্ডটা আমার হাত থেকে নিলেন এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টে পরীক্ষা করার পর ফিরিয়ে দিয়ে একটু হাসলেন।—জয়ন্তবাবু, আমার এই সংশয়কে ক্ষমা করবেন। আপনাকে খোলাখুলিই বলছি, দাদার প্রতি আমার এতটুকু বিশ্বাস নেই।

—কেন সৌমেন্দুবাবু?

—ওঁর এখানে আসার মধ্যে অবশ্যই কোন মতলব আছে। কিন্তু শুধু বুঝতে পারছিনা—আপনাদের কেন উনি আনলেন? বিশেষ করে ওই কর্নেল ভদ্রলোকের নাম আমার শোনা আছে—উনি একজন সখের গোয়েন্দা—তাই না?

—ঠিকই বলেছেন।

—একটা পোড়ো খনির মুখ বন্ধ করার মধ্যে কী রহস্য থাকতে পারে, সত্যি আমি বুঝতে পরছিনা সৌমেন্দুবাবু।

—পারে বইকি।···বলে সৌমেন্দু কেমন হাসলেন। তারপর চাপা গলায় ফের বললেন—আমার বরাবর ধারণা, ওই খনির সুড়ঙ্গে কোথাও গুপ্তধন লুকোনো আছে।

—বলেন কী মশাই!

—হ্যাঁ, জয়ন্তবাবু। এই আমার বরাবরকার অনুমান। কিন্তু কিছুতেই মাথায় ঢোকে না, ওখানে কে গুপ্তধন পুঁতে রাখতে গেল? কখন পুঁতল?

আমি হতভম্ব হয়ে গেছি কথাটা শুনে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ সৌমেন্দু বললেন—চলুন, অপনার ওই কর্ণেল তো ছিপ নিয়ে বসবেন না। অতএব আমি ওঁর ছিপটা নিয়ে মাছ ধরতে বসব। কিন্তু একটা কথা—আমি ছিপটা দাদার কাছে গিয়ে আনতে পারব না। আমি দূরে দাঁড়াব। আপনি এনে দেবেন। দাদার কাছে জেনে নেবেন কিন্তু, কোন ঘাটে কর্ণেলের বসার কথা ছিল। সে ঘাটেই আমি বসব।···

লেকের এই দক্ষিণ ধারটা পাহাড় থেকে ঢালু বা গড়ানে অবস্থায় জলে নেমে গেছে। অজস্র ঝোপঝাড় ও পাথর আছে এখানে। বাঁদিকে অর্থাৎ পশ্চিমে সেই পাথর-বাঁধানো ঘাটে কর্ণেলের বসার কথা। সেখানেই সৌমেন্দু বসলেন। আমি বসলুম তার আন্দাজ তিরিশ গজ দরে—ঝোপের মধ্যে থেকে একটা পাথর জলঅব্দি নেমে

গেছে, তার ওপর। আমি সৌমেন্দুর ছিপের ডগাটা শুধু দেখতে পাচ্ছিলুম। আর, ইন্দ্রনাথ বসেছেন আমার ডাইনে আন্দাজ চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ দূরে। সেখানেও এমনি পাথর আছে। কিন্তু আমি ইন্দ্রনাথের ছিপটা দেখতে পাচ্ছিলুম না। ও ঘাটটা সম্পূর্ণ আড়ালে পড়ে গেছে।···

হ্রদের জল এখন মোটামুটি শান্ত। আমার পিছন থেকে বাতাস বইছে বলে আমার ঘাটের জলটা কাচের মতো নির্ভাঁজ আর স্বচ্ছ দেখাচ্ছিল। পশ্চিমের উপত্যকায় সেই ভুতুড়ে খনি অঞ্চল—বেশ ফাঁকা খানিকটা জায়গা। ঝোপঝাড় অবশ্য আছে। কিন্তু কোন পাহাড় না থাকায় সূর্যের আলো এসে হ্রদের জলকে গোলাপী আলোয় রাঙিয়ে তুলছিল। ছিপে বসতে যে একাগ্রতার দরকার, এখন তা আর আমার নেই। মাথায় সৌমেন্দুর গুপ্তধন কথাটা ভেসে আসছে। বারবার পশ্চিমের ওই উপত্যকার দিকেই তাকাচ্ছি। ফাৎনা স্থির হয়ে ভেসে আছে। হ্রদে প্রচুর মাছ আছে শুনেছিলাম, কিন্তু একবারও ফাৎনা নড়তে দেখলুম না। চারে মাছ এলে বুজকুড়ি ফুটবে জলে। তারও কোন লক্ষণ নেই। বসে থেকে বিরক্তি ধরে গেল। অনেকগুলো সিগ্রেট খেয়ে ফেললুম। বারকতক ছিপ তুলে টোপও দেখলুম। মাছে ঠোকর দেয় নি। ঘড়িতে তখন পাঁচটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। হ্রদের জলের গোলাপী রঙ ঘিরে ধূসর কুয়াশা জেগে উঠছে। দূরের পাহাড়গুলো কালো হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। যে সব পাখি হ্রদের আকাশে ওড়াউড়ি করছিল, এতক্ষণে তারা পাহাড়-জঙ্গল লক্ষ্য করে ডানা মেলছে। হঠাৎ আমার ছিপের সুতোয় টান পড়ল এবং হুইলের ঘরঘর শব্দ শোনা গেল। ছিপটা চেপে ধরে, দেখি, সুতো প্রচণ্ড বেগে জলের তলায় ছুটছে। নির্ঘাৎ কোন প্রকাণ্ড মাছ বঁড়শী গিলেই গেঁথে গেছে, আমাকে খ্যাচ মারার সুযোগও দেয় নি।

ছিপের ডগা বেঁকে যাচ্ছিল। সামলাতে না পেরে উঠে দাঁড়ালুম। একটু পরেই মাছটা স্থির হল। তখন সুতো গুটোতে শুরু করলুম।

মাছটা অন্তত কিলো দশকের কম হবে না। কাছাকাছি আসার পর মাছটা এক লাফ দিয়ে ডাইনে ঘুরল। তারপর পাড়ের সমান্তরালে জল ভেঙে দৌড় দিল। পাড়ের কাছাকাছি বলে এসব জায়গায় অজস্র পাথর জলের ভিতরে এবং উপরে ঘাপটি পেতে রয়েছে। ভয় হল, নির্ঘাৎ এবার মাছটা কোন পাথরের খাঁজে ঢুকে যাবে এবং আমার সুতোটা ছিঁড়ে ফেলবে।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ইন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠলুম—ইন্দ্রনাথ-বাবু! ইন্দ্রনাথবাবু!

চেঁচানোর উদ্দেশ্য, মাছটা ওঁর ঘাটের দিকেই যাচ্ছে। উনি যদি এখন কোনভাবে ওঁর বঁড়শীতে বা সুতোয় ওটাকে আটকাতে পারেন, মাছটা হাতছাড়া হবার সুযোগ পাবে না।

আমার ডাকের পর মনে হল উনি সাড়া দিলেন—সেটা আমার শোনারও ভুল হতে পারে। কারণ, ঠিক তখনই যা ভয় করেছিলুম—তাই হল। সুতোটা ঢিলে হয়ে নেতিয়ে গেল। গুটিয়ে আনার পর দেখি, ফাৎনাসুদ্ধ ছিঁড়ে মাছটা সম্ভবত পাথরের তলায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। ফাৎনাটা খুঁজলুম। আলো কমে গেছে। এখান থেকে দেখা গেল না। তখন আরো ভালো করে দেখার জন্য ইন্দ্রনাথের ঘাটের কাছে গেলুম।

ঝোপ ঠেলে গিয়ে দেখি, ইন্দ্রনাথ পাথরে পা ঝুলিয়ে বসে দোলাচ্ছেন। ছিপটা তুলে পাশে রেখেছেন। জলের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। ব্যাপার কী?

আমার পায়ের শব্দে ঘুরে তাকালেন। তারপর হো হো করে হেসে উঠলেন।—আসুন, আসুন জয়ন্তবাবু। আপনারও দেখছি আমার অবস্থা হয়েছে। লেকের মাছগুলো খুব শক্তিমান। বরাবর এই কাণ্ডটি ঘটে বলে এবার বিলিতি কোম্পানির সুতো আনলুম—তাও টিঁকল না।

বললুম—ডাকছিলুম, শোনেন নি?

ইন্দ্রনাথ বললেন—হুঁ শুনেছি। কিন্তু তখন সাড়া দেবার ফুরসৎ কোথায়? চলুন—আলো কমে গেছে। আজ আর আশা নেই। কাল সকাল থেকে ফের বসা যাবে।

দুজনে পাশাপাশি ঢালু বেয়ে ওঠা শুরু করলুম। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনাথ বললেন—সৌম অবশ্য আমাদের মতো আনাড়ি নয়। আমি জানি জব্বলপুর থেকে গাড়ি করে এসে ও মাছ ধরে। বিলক্ষণ অভ্যাস আছে। এজন্যেই সম্ভবত জব্বলপুর ছেড়ে যেতে চায় না।

বললুম—দেখে আসব নাকি?

—থাক। ও একটু গোঁয়ার প্রকৃতির ছেলে। ডিসটার্ব করলে খুশি হবে না। আসুন, আমরা বাংলোয় গিয়ে আরামে কফি খাব।......

বাংলোয় গিয়ে দেখি, সর্বেশ্বরী বারান্দায় বসে রয়েছেন। রঘুবীরের সঙ্গে কথা বলছেন। ভাস্করপোকে একবার দেখে বললেন—মাছ হল না? ইন্দ্রনাথ জবাবে একটু হাসলেন মাত্র। তারপর আমরা বারান্দার উত্তরদিকে একটু তফাতে বসলুম। ইন্দ্রনাথ রঘুবীরকে বলে দিলেন—কফি খাব।

একটু পরে কফি খেতে খেতে কর্ণেল ও শর্মার গলার আওয়াজ পেলুম। তখনও অন্ধকার ঘন হয় নি। গোধূলিকাল বলা যায়। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলুম কর্ণেল ও শর্মা ঘাটের দিক থেকেই আসছেন। কিন্তু তাঁদের আসার মধ্যে কেমন ব্যস্ততা ছিল। খোলা বারান্দায় আমাদের দেখতে পেয়েই কর্ণেল চেঁচিয়ে বললেন—ইন্দ্রনাথবাবু! সৌমেন্দুবাবু ফিরেছেন?

ইন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়ে বললে—না। ও এখনও ঘাটে আছে।

কর্ণেল ওমনি ঘুরলেন এবং হাস্যকর ভঙ্গীতে দৌড়ে, যেদিক থেকে আসছিলেন—অর্থাৎ সেই পাথরের ধাপবন্দী ঘাটটার দিকেই চলে গেলেন। শর্মা দাঁড়িয়ে ওঁর চলে যাওয়া দেখছিলেন। ইন্দ্রনাথ ও

আমি বারান্দা থেকে তক্ষুনি ওঁর কাছে চলে গেলুম।

ইন্দ্রনাথ বললেন—ব্যাপার কি মিঃ শর্মা ?

শর্মার যেন এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরল।—ইন্দ্রনাথ! ঘাটে সৌমেন্দু নেই—ছিপটা জলে পড়ে আছে। আর···আশ্চর্য ঘাটের পাথরে একটুখানি রক্ত। আমরা ভাবলুম, মাছের রক্ত। কিন্তু···

কথা শেষ করার আগেই কর্ণেলের ডাক এল—ইন্দ্রনাথ! মিঃ শর্মা! চলে আসুন।

সবাই দৌড়ে গিয়ে দেখি ঘাটের ওপর দিকে ঝোপে কর্ণেল দাঁড়িয়ে আছেন। ঝোপে ঢুকে আমার মাথা ঘুরে গেল। শরীর অবশ হয়ে উঠল। ইন্দ্রনাথ ভাঙা গলায় আর্তনাদ করে উঠলেন—সৌম!

সৌমেনের বুকে একটা ছোরা বিঁধে রয়েছে। বিঁধে আছে বলেই বিশেষ রক্ত পড়ে নি। চিত হয়ে ঘাসের ওপর পড়ে আছেন উনি। চোখদুটো খোলা। মুখে বিকৃত ভাব। মুহূর্তে আমার মনে পড়ে গেল, কর্ণেলের মুখে শোনা সেই ছড়াটা :

'খোকন গেছে মাছ ধরতে
ক্ষীর নদীর কূলে,
ছিপ নিয়ে গেছে কোলাব্যাং
মাছ নিয়ে গেছে চিলে।···'

বিন্দিয়া নামে পাঁচ মাইল দূরে একটা ছোট শহর আছে। সেখানেই থানা। ইন্দ্রনাথ সেই গাড়িটা চালিয়ে থানায় গিয়েছিলেন। ফিরলেন সাতটা নাগাদ। সঙ্গে একদল পুলিশ। অফিসার-ইন-চার্জের নাম মিঃ লাল। ভদ্রলোক খুব রাগী মানুষ। এসেই প্রথমে চোখ পড়ল রঘুবীর আর রাঁধুনী বেচারার দিকে। ধমক দিয়ে বললেন—এই ব্যাটারাই খুন করেছে! শুনে ওরা ঠকঠক করে কাঁপতে ঈশ্বর-রামজী-হনুমান-গণেশ তাবৎ দেব-দেবতার কিরে খেতে থাকল।

বেগতিক দেখে কর্ণেল তার পরিচিতিপত্রটি বের করলেন। সম্প্রতি এটি তিনি ভারত সরকারের কাছে লাভ করেছেন। এটি এতদিন ছিল না বলে তাঁকে নানান অসুবিধায় পড়তে হচ্ছিল। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার পরামর্শে যোগাড় করতে হয়েছে।

পরিচিতিপত্র দেখে মিঃ লাল একটু সংযত হলেন। কিন্তু ঠোঁটে বাঁকা হাসিটা রয়ে গেল। বললেন—আপনার সাহায্য পেলে খুশি হবো নিশ্চয়। কিন্তু কর্ণেল স্যার, এ হল মধ্যপ্রদেশের জঙ্গল। যত সব খুনে ডাকাতের আড্ডা। কথায় কথায় ওরা খুন খারাবি করে। আশা করি, খবরের কাগজ পড়ে তা আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। এই লোকদুটোর চেহারা দেখেই বুঝেছি এরা ঘড়েল ক্রিমিনাল। রেকর্ড খুঁজলে নিশ্চয় সব বেরোবে। যাক্ গে, এখন আমাদের রুটিনওয়ার্কে নামতে হবে।

টর্চের আলোয় সরজমিন তদন্ত শুরু হল। লাশটা সেখানেই পড়ে ছিল। লাশের কাছে একটা হেরিকেন রেখে সর্বেশ্বরী, মিঃ শর্মা, এবং আমি এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম। কর্ণেল বাংলোয় (লাশটা থেকে পঞ্চাশ গজ ওপরে) রঘুবীর ও রাঁধুনীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। মিঃ লালের সঙ্গে সবাই লাশের কাছে আসার পর ওইসব ব্যাপার ঘটেছে।

মিঃ লাল টর্চের আলো ফেলে লাশ পরীক্ষা করতে করতে বললেন —মনে হচ্ছে ঘাটে মাছ ধরার সময় খুনী ছুরি মেরেছে। তারপর লাশটা টেনে এখানে এনেছে। আপনি কী বলেন কর্ণেল স্যার?

কর্ণেল একটু কেশে বললেন—ঠিক তাই বটে। ঘাটে কিছু রক্ত রয়েছে।

অমনি মিঃ লাল ও দুজন কনস্টেবল ঘাটের দিকে এগোলেন। কর্ণেল আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—জয়ন্ত যদি অসুস্থ বোধ করো, বাংলোয় গিয়ে বিশ্রাম করো।

অসুস্থ বোধ করা স্বাভাবিক। কিন্তু মনে হল, কর্ণেল আমাকে কোন গূঢ় আদেশ দিচ্ছেন। অতএব ভালছেলের মতো আমি

বাংলোয় চলে গেলুম।

বাংলোর বারান্দায় একটা কাচঢাকা ল্যাম্প রয়েছে। ঘরের দরজা বন্ধ। বারান্দায় দুজন রাইফেলধারী সেপাই বসে রয়েছে। তারা আমার দিকে তাকাল মাত্র। তারপব চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলতে থাকল। আমি ঘরে ঢুকলুম। মোম দেখেছিলুম দিনে। দেশলাই জ্বেলে একটা ধরালুম। তাবপর খাটে বসে পড়লুম

এ ঘরে একটা বড় বিলিতী খাট আছে—তাতে কর্ণেল ও আমার শোবার ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যপাশে একটা ক্যাম্পখাট পাতা হয়েছে ইন্দ্রনাথের জন্যে। হঠাৎ চোখে পড়ল ওই খাটটার তলায় দলাপাকানো একটা কাগজ পড়ে রয়েছে। অন্যসময় হলে কিছুই ভাবতুম না। কিন্তু এখন একটা সদ্য খুন হয়েছে এবং কর্ণেলের মতো ঘুঘুও রয়েছেন। সঙ্গগুণে এসব ক্ষেত্রে আমার মধ্যে গোয়েন্দা পোকা অর্থাৎ টিকটিকিটা খুব ব্যস্ত হয়ে ওঠে। অতএব তক্ষুণি কাগজটা কুড়িয়ে এনে খুলে ফেলল ুম। খুব পুরনো কাগজ। কোণায় ছাপানো সনতাবিখ দেখেই বুঝল ুম, এটা কা বা ডায়রিব ছেঁড়া পাতা। তারিখটা হচ্ছে ১৭ আগস্ট ১৯৬৮ সাল, রবিবার। পাতার নীচের দিকটা ছেঁড়া। তাতে শুধু লেখা রয়েছে ইংরিজিতে: 'C⁴'। খুব বড় হরফে কালো কালিতে কেউ লিখেছে। কালি পরীক্ষা করে মনে হল খুব পুরনো।

ধুরন্ধর গোয়েন্দার শিষ্য আমি। তাই কাগজটা পকেটে রেখে দিলুম। গুরুদেবকে দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেব। এবং এরপর স্বভাবত আমার মাথায় তদন্তের পোকাটা আরও চঞ্চল হয়ে উঠল। তখন ইন্দ্রনাথের বিছানা হাতড়াতে ব্যস্ত হলুম। আমার তদন্ত ব্যর্থ হল। তেমন সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। তলায় ওঁর একটা স্যুটকেস রয়েছে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলুম, সেটা খোলা। তখন সাবধানে খুলে ফেললুম। কয়েকটা প্যান্টশার্ট আর দুটো হুইস্কির বোতল ছাড়া

আর কিছু নেই। এই সময় বাইরে পায়ের শব্দ হতেই ঝটপট সরে এলুম।

দরজায় দেখা দিলেন সর্বেশ্বরী। ব্যস্ত হয়ে বললুম—আসুন, আসুন মা।

সর্বেশ্বরী ঢুকে ইন্দ্রনাথের খাটে বসে পড়লেন। সন্ধ্যা থেকেই দেখছি, উনি স্তব্ধ এবং যেন নির্বিকার—কিংবা যেন ভীষণ-বিমূঢ়। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছেন শুধু, এক ফোঁটা চোখের জল পড়তে দেখি নি। এখন চুপচাপ বসে সেই শক খাওয়া কিংবা নির্বিকার চাহনিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। ভয় হল, উনি পাগল হয়ে যান নি তো এই আকস্মিক আঘাতে? একটু অস্বস্তি হল। বললুম—কী সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেল বলুন তো! কী বলে যে আপনাকে সান্ত্বনা দেব, ভেবে পাচ্ছি না! সৌমেন্দু বাবু…

বাধা দিয়ে সর্বেশ্বরী মুখ খুললেন এবার। —এ আমি জানতুম, বাবা জয়ন্ত।

অবাক হয়ে বললুম—জানতেন?

—হ্যাঁ। ওই অভিশপ্ত খনি কাকেও রেহাই দেবে না। কোন-না-কোন ভাবে রায়বংশের সবাইকে শেষ করবে। বলবে, কেউ ছুরি মেরেছে সৌমেন্দুকে। হ্যাঁ—মেরেছে। কিন্তু যে মেরেছে, সে নিজেও জানে না কেন ওকে ছুরি মারল।…দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের শোকাবেগ যেন দমন করলেন সর্বেশ্বরী। ফের বললেন—আমি যা জানি তোমরা কেউ তো তা জানো না, বাবা জয়ন্ত। বললে বিশ্বাস করবে না। ওই অভিশপ্ত জায়গাটা কেনার কথাবার্তা চলতে চলতেই আমার ভাসুর আর বড় জা হঠাৎ মারা গেলেন—একমাস আগে-পরে। আমি বাধা দিলুম। তাই কেনা হয় নি। কিন্তু আমার স্বামী না জানিয়ে উনিশ বছর পরে কখন কিনে বসলেন। শর্মা ওর বন্ধু। শর্মাই নাকি কবে সার্ভে করে দেখেছিলেন, ওখানে মাটির তলায় অনেক সীসে আছে। তারপর তো খনির কাজ শুরু হল। আমার কপাল ভাঙল।…

উনি চুপ করলে বললুম—আপনারা খনি শুরু করার আগে জায়গাটা তাহলে এমনি পড়ে ছিল ?

মাথা দোলালেন সর্বেশ্বরী। তারপর বললেন—পড়ে ছিল ঠিকই। কিন্তু ব্রিটিশ আমল থেকেই গুজব রটেছিল যে ওখানে সীসের খনি আছে।

—কিন্তু তাহলে ওই উনিশ বছর ধরে কেউ খনির কাজ করে নি কেন ?

—ওখানে এক সাধু থাকতেন। তিনিই বরাবর ভূপালের নবাবকে ধরে কাকেও ইজারা নিতে দিতেন না। উনিশ বছর পরে হঠাৎ সাধু অদৃশ্য হলেন। তখন আর আমার স্বামীর পক্ষে কেনার বাধা রইল না। নবাবের এক উত্তরাধিকারীর কাছে সস্তায় কিনে ফেললেন। তখন দেশীয় রাজাদের সম্পত্তি সরকার দখল করতে শুরু করেছেন। তাই বেগতিক দেখে ওরা বেচে দিলেন। কিন্তু বাবা, তোমরা তো একালের ছেলে—কিছু বিশ্বাস করো না। সাধু কিন্তু বরারর অদৃশ্য হয়ে ওখানে বাস করতেন। এতদিনও করেছিলেন। কদিন আগে এক রাতে আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন—বেটি, চলে যাচ্ছি। খনির মুখ বন্ধ করে দে এবার।

—সাধুকে আপনি কি দেখেছেন কখনও ? মানে—স্বপ্নের কথা বলছি না।

—হ্যাঁ। একবার প্রত্যক্ষ দেখেছিলুম। খানিকটা দূর থেকে। টকটকে ফর্সা রঙ—লাল জটা, দাড়ি গোঁফও লাল। একেবারে উলঙ্গ বলা যায়। চোখ দুটো নীল—জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। আমার চোখে চোখ পড়ামাত্র একটু হেসে অদৃশ্য হলেন।

লাল জটা, দাড়ি, গোঁফ। চোখ নীল। টকটকে ফর্সা রং। মনে মনে হাসলুম। অলৌকিক পুরুষ যখন, তখন ভারতবাসীর আদর্শ চেহারা যা, অর্থাৎ একেবারে সায়েবদের মতোই হবেন বই কি। দুশো বছর ব্রিটিশ শাসনে থেকে আমাদের চোখে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তা

সায়েবদের ওপর আরোপ করার অভ্যাস হয়েছে। আমাদের দেবতারাও তো' সায়েবদের মতো পুরুষ'। অবশ্য দেবীরা ভাগ্যিস এদেশী থেকে গেছেন।

দুজনেই চুপ করে আছি। এক সময় সর্বেশ্বরী হঠাৎ নড়ে উঠলেন। চাপা গলায় বললেন—ইন্দ্র আমার কথা শুনছে না। তুমি দেখে নিও, ওরও কী ঘটে। আমার কী?

বলে উনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর যেমন এসেছিলেন, বেরিয়ে গেলেন। ওপাশে ঘরের দরজা খোলার শব্দ হল। হয়তো অন্ধকারেই শুয়ে পড়লেন বিছানায়। আমি ওর কথাগুলো ভাবতে থাকলুম। তারপর মনে পড়ল কাগজটার কথা। C^2 লেখা আছে। কোন সংকেত বাক্য কি? কাগজটা কার? কে অমন করে ফেলে দিয়েছে?

এই সময় কর্ণেলদের সাড়া পাওয়া গেল। ওঁরা সবাই বারান্দায় এলে বেরিয়ে গেলুম। মিঃ লাল চেয়ারে বসে বললেন—লাশটা আর ওভাবে ফেলে রাখার মানে হয় না। কী বলেন কর্ণেল স্যার? আমাদের যা দেখাশোনার ছিল, হয়ে গেছে। এবার একটা খাটিয়া নিয়ে গিয়ে ওটা আনা যাক্।

কর্ণেল বললেন—হ্যাঁ। ঠিকই বলেছেন মিঃ লাল।

—তাহলে ইন্দ্রনাথবাবু, আপনি প্লীজ সেই ব্যবস্থাই করুন। কাল সকালের আগে এ্যাম্বুলেন্স আসার কোন চান্স নেই। তারপর মর্গে যাক্। এবার আমরা আরও কিছু জরুরী কাজকর্ম সেরে নিই।

ইন্দ্রনাথ রঘুবীর ও রাঁধুনীকে ডেকে বাংলো থেকে একটা ক্যাম্প খাট বের করলেন। লাশের কাছে দুজন সেপাই রেখে এসেছেন মিঃ লাল। বয়ে আনতে কোন অসুবিধা হবে না। দারোগাবাবু একটা ফাইল খুলে পেন্সিল চালনা শুরু করলেন। কর্ণেল আমার হাত ধরে বললেন—চলো জয়ন্ত, আমরা একটু জিরিয়ে নিই। আজ আর ডিনার খাবার বিন্দুমাত্র আশা রেখো না। কেমন?

ঘরে ঢুকে আমাদের খাটে বসলুম দুজনে। তারপর সেই কাগজ দিলুম ওকে এবং সংক্ষেপে সর্বেশ্বরীর কথাগুলোও জানালুম।

কগজটা পরীক্ষা করার পর কর্ণেল পকেটে ঢোকালেন। চাপা গলায় বললেন—জয়ন্ত, আমি যা অনুমান করেছিলুম, তা যে ভুল নয়—তার প্রমাণ পেলুম।

বললুম—কী অনুমান করেছিলেন, কর্ণেল ?

কর্ণেল আমার কথার জবাব না দিয়ে হাতের টর্চটা জ্বেলে মেঝেয় আলো ফেললেন। তারপর ইন্দ্রনাথের খাটের কাছে গিয়ে হাঁটু দুমড়ে বসলেন। বললেন—জয়ন্ত, দেখে যাও।

কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখি, পাথরের মেঝেয় কয়েকটা দুইঞ্চি-দেড়ইঞ্চি এবং একইঞ্চি দাগ। দাগটা কালো। বললুম—ও কিসের দাগ ?

—মনে হচ্ছে জুতোর গোড়ালির, কিম্বা ডগার। দেখ জয়ন্ত, আমরা বিকেলে বেরিয়ে যাওয়ার পর কেউ এ ঘরে ঢুকেছিল। সে বাইরে থেকেই এসেছিল।...বলেই কর্ণেল আরেক জায়গায় আলো ফেলে অস্ফুট স্বরে বললেন—মাই গুডনেস!

দেখি ওখানেও একই রকম দাগ। কিন্তু এই দাগগুলো সবুজ রঙের। বললুম—কর্ণেল, নিশ্চয় তাহলে এসব জুতোর দাগ নয়। অন্য কিছু।

—না জয়ন্ত। এবার বুঝলুম, দুজন এসেছিল এই ঘরে। এক-জন এসেছিল ঘাট থেকে। ঘাটের ধাপে শেওলা আছে। সবুজ দাগ তারই। কিন্তু কালো দাগ কার জুতোর ? এখানে কালো মাটি আছে একমাত্র খনির ওখানে। খনিতে তো আমি আর মিঃ শর্মা এই দুজনে গিয়েছিলুম। কিন্তু, আমরা কেউ এ ঘরে আসি নি। অতএব অন্য কেউ এসেছিল। সে কে ?

—কর্ণেল, তখন বাংলোয় রঘুবীর, রাঁধুনী আর সর্বেশ্বরী ছিলেন। তাঁদের জিগ্যেস করা যায়।

—করব। তবে এটা ঠিক, ওরা কেউ এ ঘরে এলেও এই দাগগুলোর জন্য ওরা দায়ী নয়। কারণ, দাগগুলো পুরুষ মানুষের জুতোর। এবং ওই তিনজনের মধ্যে রঘুবীর আর রাঁধুনী জুতো পরে না। সর্বেশ্বরী স্লিপার পরেন। এ দাগ স্লিপারেরও নয়। স্লিপারের দাগ আরও বড় হওয়া উচিত।

—তাই মনে হচ্ছে।

কর্ণেল চিন্তিতমুখে উঠে এসে ফের খাটে বসলেন। তারপর বললেন—ইন্দ্রনাথ বাবুকে বলেছিলুম—জব্বলপুরে একটা টেলি পাঠাতে। ওখানে সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টরকে আমার নামে টেলি করা হয়েছে। সম্ভবত ওঁরা কেউ এসে পড়বেন আজ রাত্রে, অথবা সকালে। বলা বাহুল্য মিঃ লাল চটে যাবেন। কিন্তু উপায় কী? এই হত্যাকাণ্ড খুব সহজ ঘটনা বলে মনে হচ্ছে না জয়ন্ত। এর পিছনে একটা জটিল রহস্য আছে যেন।

হঠাৎ সৌমেন্দুর কথাটা মনে পড়ে গেল। কর্ণেলকে সেটা জানালুম। শুনে উনি ঘনঘন মাথা নাড়তে থাকলেন। তারপর বললেন—গুপ্তধন সত্যি করে থাক, বা নাই থাক্—একটা গুজবের ব্যাপার নিশ্চয় আছে, তা প্রথমেই অনুমান করেছিলুম। জয়ন্ত, গুপ্তধনের গুজবের মতো ভয়ঙ্কর সর্বনেশে আর কিছু নেই।

—কর্ণেল! কাগজের ওই সংকেতটা গুপ্তধনের ঠিকানা নয় তো?

কর্ণেল হেসে ফেললেন। —তোমার অনুমানে যুক্তি থাকতেও পারে। কিন্তু ডার্লিং, তাহলে ওটা অমন তাচ্ছিল্য করে কেউ ফেলে দেবে কেন?

—ফেলে দিয়েছে। কারণ, সে ভেবেছে একটা বাজে কাগজ।

কর্ণেল আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমার যুক্তিতে সারবত্তা উঁকি দিচ্ছে। খুব খুশি হলুম, জয়ন্ত।

উনি চুরুট ধরিয়ে কী ভাবতে থাকলেন। একটু পরে বললুম—থাক্‌গে। আপনি আর ডঃ শর্মা খনিতে কী করছিলেন অতক্ষণ?

হঠাৎ ঘাটের দিকেই বা গেলেন কেন? কোন পথে গেলেন?

কর্ণেল একটু হেসে বললেন—খনিটা দেখে মনে হল, সত্যি ভূতের আড্ডা। খানাখন্দ প্রচুর। তত ঝোপঝাড়। বারোটা পিট ছিল। তিনটে বাদে সব বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনটের মধ্যে একটা ধস নেমে প্রায় বুজে গেছে। দুটো পিট এখনও খোলা। কিন্তু জঙ্গল গজিয়েছে। ভেতরে ঢোকার কথা ভাবা যায় না। শর্মা তো ভেবেই পেলেন না কোথায় ডিনামাইট বসাবেন। ও দুটোর কাছে কোন পাথর নেই—তাছাড়া মুখগুলোর চারপাশে গভীর খাদ, জল রয়েছে। মুখের কাছে যথেষ্ট মাটিও নেই যে ডিনামাইট চার্জ করলে ধস ছাড়বে। এক হতে পারে, সুড়ঙ্গের ওপরে গর্ত খুঁড়ে ডিনামাইট বসানো। কিন্তু সুড়ঙ্গ কোন পথে কী ভাবে মাটির তলায় গেছে, না জানলে তো কিছুই করা সম্ভব নয়। ওপর থেকে বুঝবে কী করে?

—সুড়ঙ্গে ঢোকা যায় না?

—যায়। কিন্তু তখন যথেষ্ট আলো নেই। তাছাড়া ভেতরে বিযাক্ত গ্যাস থাকতে পারে। না পরীক্ষা করে ঢোকা যায় না। অবশ্য, আমরা দুজনে সুড়ঙ্গের অন্য মুখ আছে কি না খুব তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। পাই নি। শর্মার তো পরিচিত জায়গা। উনি কোন মুখ দেখেন নি। এবারও দেখতে পান নি।

—অন্যমুখ ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না, কর্ণেল।

কর্ণেল ব্যাখ্যা করে বললেন—পোড়ো খনির সুড়ঙ্গে জীবজন্তুরা বাসা বাঁধে। তাছাড়া প্রাকৃতিক কারণেও কোন জায়গায় ফাটল দেখা যায়। জীবজন্তুদের স্বভাব হচ্ছে, ঢোকার মুখ পেলেই সহজ প্রবৃত্তি অনুসারে বেরিয়ে যাবার একটা মুখ খোঁজে। না থাকলে নখের আঁচড়ে গর্ত করে সেটা বানিয়ে নেয়। সজারু ইত্যাদি কয়েক রকম গর্তবাসী প্রাণীর এ অভ্যেস আছে। আমরা ওখানে অজস্র সজারুর কাঁটা পড়ে থাকতে দেখেছি বলেই অন্যমুখ খুঁজছিলুম। কিন্তু তেমন

কিছু দেখলুম না। হয়তো ছোট্ট ফোঁকর থাকতে পারে—তা দিয়ে মানুষ ঢোকা বা বেরুনো অসম্ভব।

বাইরে লাশটা এসেছে। আমরা বেরিয়ে গেলুম। চাদরে ঢাকা লাশটা বারান্দায় খাটিয়াতে রাখা হচ্ছিল। সর্বেশ্বরী তখনও ঘরের ভেতরে আছেন। ভেতরে অন্ধকার। শর্মা দারোগাবাবুর সামনে গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। সম্ভবত প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন এতক্ষণ।

কর্ণেল গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। ইন্দ্রনাথ এদিকের ঘরে এসে ঢুকলেন। আমি একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর ইন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলতে ফিরে এলুম। ঘরে ঢুকে দেখি, ইন্দ্রনাথ ব্যস্তভাবে বিছানা হাতড়াচ্ছেন। বললুম—কী খুঁজছেন ?

ইন্দ্রনাথ কোন জবাব না দিয়ে স্যুটকেসটা টানলেন। তারপর বলে উঠলেন—হুঁ। যা ভেবেছিলুম, তাই!

—কী মিঃ রায় ?

ইন্দ্রনাথ গম্ভীর মুখে উঠে তাঁর খাটে বসলেন। বললেন—নিশ্চয় সৌম্যের কাজ। আমি যখন ঘাটে ছিলুম, ও এসে স্যুটকেসের তালা ভেঙেছিল। ও ছাড়া আর কে ভাঙবে ?

—কেন বলুন তো ইন্দ্রনাথবাবু!

ইন্দ্রনাথের মুখটা লাল হয়ে উঠল। নিজেকে সংযত করে আস্তে আস্তে বললেন—ওর মাথায় একটা অদ্ভুত বোকামি ঢুকে পড়েছিল। ও ভাবত, খনিতে কোন গুপ্তধন আছে এবং তার সন্ধান আমার হাতে রয়েছে। বরাবর সুযোগ পেলেই আমার জিনিসপত্র হাতড়ানো অভ্যাস ছিল ওর।

ওঁকে সেই কাগজের কথাটা বলার জন্যে খুব ইচ্ছে সত্ত্বেও চেপে গেলুম। কিন্তু আমার মাথায় টিকটিকির উৎপাত। তাই কৌশলে প্রশ্ন করলুম।—কিছু খোওয়া গেছে দেখলেন, মিঃ রায় ?

ইন্দ্রনাথ গম্ভীর হয়েই জবাব দিলেন—হ্যাঁ। কলকাতায় বাঁড়শী

কেনার সময় দোকানদার আমাকে একটুকরো কাগজের মোড়কে সেটা জড়িয়ে দিয়েছিল। এখানে এসে মোড়কটা খুলে' দেখি, ওটা একটা ডাইরি বইয়ের ছেঁড়াপাতা। লেখা ছিল C^2 ইংরেজি হরফে। কিন্তু তারিখটা দেখে অবাক হয়েছিলুম। ১৯৬৮ সালের ১৭ আগস্ট, রবিবার। ওইদিনই কাকা মারা যান। এটা নিছক দৈবাৎ যোগাযোগ ছাড়া কিছু নয়। তবু মনটা একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ওটা বালিশের তলায় এমনি-এমনি রেখে দিয়েছিলুম। সেটা এখন আর পাচ্ছি না।

এবার আর না বলে পারলুম না যে ওটা দলাপাকানো অবস্থায় আমিই পেয়েছি এবং কর্ণেলকে দিয়েছি। শুনে ইন্দ্রনাথ হতাশভাবে মাথাটা দোলালেন। বললেন—বেশ বুঝতে পারছি। সৌম্যই ওটা হাতড়ে বের করেছিল। তারপর মাথামুণ্ডু বুঝতে না পেরে ফেলে দিয়েছিল দলা পাকিয়ে। হয়তো ভেবেছিল, C^2 কথাটা মুখস্থ রাখা যখন সোজা, তখন কেন চুরি করি দাদার কাছ থেকে ?

—কিন্তু যেভাবে ছিল, সেভাবেই রাখতে পারত ?

—সৌম্যের স্বভাব এই। সহজে রেগে যেতো। অদ্ভুত অদ্ভুত ভাবনা নিয়ে থাকত। খুব খেয়ালী ছেলে ও। ভেবে কোন কাজ করা ওর স্বভাবে ছিল না।

হঠাৎ কর্ণেল ঢুকে বললেন—ইন্দ্রনাথবাবু, রঘুবীর আর রাঁধুনী লোকটাকেই মিঃ লাল আসামী হিসেবে চালান দিচ্ছেন। আমার কোন কথা কানে তুললেন না।

ইন্দ্রনাথ উত্তেজিতভাবে বললেন—সে কী! কেন ?

—রাঁধুনীই বিপদটা ডেকে আনল। সৌম্যেন্দুকে যে ছুরিটা মারা হয়েছে, সেটা নাকি কিচেনেরই ছুরি। বিকেল থেকে পাওয়া যাচ্ছিল না। তাছাড়া একবার নাকি রঘুবীর বিকেলে কিচেনে ঢুকে ছুরিটার খোঁজ করেছিল।

ইন্দ্রনাথ বেরিয়ে গেলেন। কর্ণেল আমার পাশে বসে বললেন—

তোমাদের আলোচনার শেষাংশ আমি শুনে নিয়েছি, জয়ন্ত। না—এ জন্যে লজ্জা পাবার কিছু নেই। তুমি মুখটা অমন হাঁড়ি করো না। এবার একটা অদ্ভুত ব্যাপার শোন। বড়শী একটা মোড়কে ছিল, তা সত্যি। কিন্তু সেই অরিজিন্যাল মোড়ক বদলে এখানে আসার পর কেউ দ্বিতীয় মোড়কটা পাচার করে। অরিজিন্যালটা আমি এইমাত্র কুড়িয়ে পেয়েছি বারান্দার নীচে। এই দেখ।

মোড়কটা দাদহাজার বিজ্ঞাপনের কাগজ। দেখে নিয়ে বললুম—মোড়ক বদলানোর উদ্দেশ্য কী?

—ইন্দ্রনাথকে সম্ভবত উত্যক্ত করা।

—বুঝলুম না।

—সি স্কোয়ার কথাটা এবং ওই তারিখ সম্ভবত ইন্দ্রনাথের ওপর কেমন প্রভাব সৃষ্টি করে কেউ দেখতে চেয়েছিল। বলা বাহুল্য, ইন্দ্রনাথ কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন বই কি।

—কিন্তু কে সে?

—যে ছবি চুরি করেছে এবং সৌম্যেন্দুকে হত্যা করেছে। সে ছাড়া নিশ্চয় আর কেউ নয়। এবং যে দু ধরনের দাগ মেঝেয় রয়েছে, তার মধ্যে সবুজ দাগ যদি সৌম্যেন্দুর জুতোর হয়, কালো দাগ নিশ্চয় সেই অজ্ঞাত ব্যক্তির জুতো থেকে হয়েছে।

কর্ণেলের এই কথায় রহস্যের জট আরও পাকিয়ে গেল। আমি গুম হয়ে রইলুম। এমন অদ্ভুত হত্যাকাণ্ডের পাল্লায় কখনও পড়ি নি।...

•

ডিনার খাওয়া হবে না জানতুম। বিস্কুট আপেল আর কফি খেয়ে শুয়ে পড়লুম আমরা। মিঃ লালের সবুর সইছিল না। আসামী দুজনকে নিজের জীপে তিনজন কনস্টেবলের সঙ্গে চালান দিলেন সেই রাত্রেই। দুজন কনস্টেবল লাশের কাছে পাহারায় রাখলেন এবং ডাইনিং টেবিলে বিছানা করে আরামে নাক ডাকাতে থাকলেন।

ডাইনিংয়ের ওপাশে দুটো রুমের একটায় সর্বেশ্বরী, অন্যটায় শর্মা শুতে গেলেন। এ পাশের রুমে আমি, কর্ণেল ও ইন্দ্রনাথ শুয়ে পড়লুম। বারান্দায় সেই ল্যাম্পটা জ্বলতে থাকল। বেচারা কনস্টেবল দুজনের জন্য আমার দুঃখ হচ্ছিল। কিন্তু মিঃ লালের কাছে ডিউটি ইজ ডিউটি।

শুয়ে জঙ্গলে রাতচরা জানোয়ারের ডাক শুনতে পাচ্ছিলুম মাঝে মাঝে। ঘুম আসছিল না। পাশে কর্ণেলের কিন্তু দিব্যি নাক ডাকছে। জানলার পর্দার ফাঁকে তারা দেখা যাচ্ছে। তারপর একসময় হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হল। বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে গেছি, কে জানে!

হঠাৎ এক সময় ঘুম ভেঙে গেল। জেগে ওঠার পর টের পেলুম বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু গাছপালা থেকে জলের ফোঁটা ঝরে পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে আমার সিগ্রেট খাওয়ার অভ্যাস আছে। সিগ্রেট ধরিয়ে দেশলাইয়ের আলোয় কোণার দিকে ইন্দ্রনাথকে দেখার চেষ্টা করলুম। দেখতে পেলুম না। ওর বিছানা খালি। তখন মাথার কাছ থেকে টর্চটা নিয়ে সাবধানে জ্বাললুম। ইন্দ্রনাথ নেই। বাথরুমে ঢুকেছেন কি? কিন্তু বাথরুমের দরজা বাইরে থেকেই বন্ধ। তখন ঘরের দরজায় আলো ফেললুম। দরজার ছিটকিনি খোলা। কপাট দুটো ঠেস দেওয়া রয়েছে। তার মানে ইন্দ্রনাথ বেরিয়েছেন।

আলো নিভিয়ে কর্ণেলের গায়ে হাত রাখলুম। অমনি বড়ো ঘুঘু আমার হাতটা চেপে ধরে ফিসফিস করে বললেন—চুপচাপ শুয়ে থাকো।

তাহলে কর্ণেল জেগে আছেন! নিশ্চয় সব লক্ষ্য করছেন কখন থেকে। উত্তেজনায় অধীর হয়ে শুয়ে রইলুম।

প্রায় দুঘণ্টা কেটে গেল! সময় যে আসলে এত দীর্ঘ, তা এই প্রথম জানলুম। তারপর দরজাটা নিঃশব্দে ফাঁক হল, বাইরের আলো

এল একটু খানি। দেখলুম ইন্দ্রনাথ ঢুকছেন। খালি গা, পরনে শুধু আণ্ডার ওয়্যার, পায়ে কেডস। ওর হাতে যা দেখলুম, তাতে গা শিউরে উঠল। একটা রিভলবার!

ইন্দ্রনাথ নিঃশব্দে দরজাটা এঁটে দিলেন। তারপর অন্ধকারে কীভাবে জুতো খুলে শুলেন, টের পেলুম না। একটু পরেই শুনি ওঁর নাক ডাকছে। তখন খুব হাসি পেল। কর্ণেলকে খুঁচিয়ে দিলুম। কর্ণেলও শুনি এবার নাক ডাকাচ্ছেন। অদ্ভুত লোক তো!

এইসময় আবার বৃষ্টি এল। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে আমার ঘুমের সম্পর্ক নিশ্চয় নিবিড়। ফলে আবার চোখের পাতা বুঁজে এল।

কী একটা স্বপ্ন দেখছিলুম, হঠাৎ স্বপ্নটা ছিঁড়ে এবং ঘুমটাকে বরবাদ করে কোথাও কোন জন্তু গর্জে উঠল যেন। জাগার সঙ্গে সঙ্গে টের পেলুম ইন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং আলো জ্বেলেছেন। আমাকে জাগতে দেখে বললেন—আসুন তো জয়ন্তবাবু, পাশের ঘরে কী গণ্ডগোল হচ্ছে মনে হল।

কিছু একটা হচ্ছে তা ঠিকই। ধস্তাধস্তির এবং চাপা গর্জনের আওয়াজ। ঘুরে দেখি কর্ণেল নেই বিছানায়। বেরিয়ে গেছেন। আমিও বেরোলুম। বারান্দায় যেতেই ডাইনিং থেকে মিঃ লালের চিৎকার শুনলুম—হ্যাণ্ডস আপ!

বারান্দায় যে সেপাই লাশের পাশে ঘাড় গুঁজে একটা কম্বলে পড়ে ছিল, তারা আচমকা জেগে রাইফেল বাগিয়ে ধরল। মিঃ লাল ফের চেঁচালেন—বুধন সিং! সূরয লাল! মেরা টরচ খো গেয়া। জলদি বাত্তি লে আও!

কয়েক সেকেণ্ডে এসব ঘটে গেল। বারান্দা থেকে ল্যাম্পটা নিয়ে সেপাইরা ডাইনিংয়ে ঢুকল। আমরাও ঢুকলুম। ঢুকে হাঁ করে তাকালুম। এ এক অদ্ভুত দৃশ্য!

কর্ণেল দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—দুহাত মাথার ওপরে তোলা। রাতের জামা ছিঁড়ে ফর্দাফাই। ঝুলছে কোমরের নীচে

অব্দি। বুকের সাদা লোম বেরিয়ে পড়েছে। হাঁফাচ্ছেন। কিন্তু মুখে অপ্রস্তুত হাসি।

তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে মিঃ লাল রিভলবার তুলে শাসাচ্ছেন।—আর কোন কথা শুনব না। দেখেই আঁচ করেছিলুম, এ ব্যাটা নিশ্চয় একজন এক নম্বর চারশো বিশ। আমার চোখ এড়িয়ে যাবে? কত খুনী জোচ্চোর দেখলুম এ্যাদ্দিন!

খুব রাগ হল আমার। বললুম—দেখুন মিঃ লাল, আপনি ভুল করছেন! উনি বিখ্যাত প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার। ওঁর পরিচিতিপত্রও আপনি দেখেছেন। ওঁকে এভাবে অপমান করাটা আপনার মোটেও উচিত হচ্ছে না। এর জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে কিন্তু।

মিঃ লাল তুমুল গর্জন করে বললেন—ইউ শাট আপ! আপনাকেও আমি ও ব্যাটার সহযোগী বলে গ্রেপ্তার করব।

ইতিমধ্যে দুপাশের দুটো দরজা খুলে সর্বেশ্বরী এবং মিঃ শর্মা বেরিয়ে হতভম্ব হয়ে তাকাচ্ছেন। ইন্দ্রনাথ বললেন—মিঃ লাল, ব্যাপারটা কী হয়েছে বলুন তো?

মিঃ লাল হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন—মশাই, আমার এক চোখ ঘুমোয়, অন্য চোখ জাগে। কপাট ফাঁক করে ও ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়েছি—কী মাল! ভাবলুম কী করে দেখা যাক। ও করল কী, একটা ক্ষুদে টর্চের সাহায্যে দেয়াল হাতড়ানো শুরু করল। তারপর দেখি, ওই দেয়াল আলমারিটার একটা ড্রয়ার টানাটানি করছে। তারপর ড্রয়ার খুলেও ফেলল দেখলুম। কী একটা বের করল। তখন আমি নেমে পা টিপে টিপে টেবিলের পিছনে গেলুম। যেই বাছাধন আসা, অমনি জাপটে ধরলুম। ভুল করে টর্চটা হাতে নেই নি। যাই হোক, ব্যাটার গায়ে অসুরের বল। যুযুৎসুর প্যাঁচে আমাকে ছিটকে ফেলে দিলে। আমি ওর জামা খামচে ধরেছিলুম। ওই দেখুন না। তারপর উঠে এক লাফে বিছানায় গিয়ে রিভলবার

হাতে নিলুম।…

কর্ণেল বাধা দিয়ে বললেন—আপনি ভুল করছেন মিঃ লাল। আমি আপনাকে ফেলে দিই নি। বরং আপনিই আমাকে……

—শাট আপ! গর্জালেন মিঃ লাল।

সর্বেশ্বরীকে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে দেখলুম। মিঃ শর্মা এগিয়ে এসে বললেন—ড্রয়ার থেকে উনি কী বের করেছেন, সেটা এবার সার্চ করা উচিত মিঃ লাল। জয়দীপ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁর ড্রয়ারে উনি কেন রাতদুপুরে হাত ভরতে গেলেন জানা দরকার।

মিঃ লাল এগিয়ে কর্ণেলের রাতের পাজামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা কালো বাঁধানো নোটবই কিংবা ডাইরি বের করে নিলেন। মিঃ শর্মা এবং ইন্দ্রনাথ দুজনে একই সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বললেন—দেখি, দেখি ওটা কী?

মিঃ লাল হয়তো ওঁদের একজনের হাতে দিয়েই ফেলতেন বইটা —কিন্তু কর্ণেল এক লাফে সরে এসে বাধা দিলেন।—খবরদার মিঃ লাল! এই ডাইরি ওদের হাতে দেবেন না। এটা একটা ভেরি ইমপরট্যান্ট ডকুমেন্ট!

মিঃ লাল রিভলবার তুলে বললেন—হ্যাণ্ডস্ আপ। নয়তো গুলি ছুঁড়ব!

অমনি কর্ণেল দুহাত তুলে দাঁড়ালেন। আমি হাসব না কাঁদব ভেবে পেলুম না। ওই অবস্থায় দাঁড়িয়ে কর্ণেল ফের বললেন—মিঃ লাল, প্লীজ! এই ডাইরি সরকারের সম্পত্তি। কারো হাতে দিলে আপনিই বিপদে পড়বেন। আর দুএক ঘণ্টার মধ্যে ডিটেকটিভ ডিপার্টের অফিসারেরা এসে পড়বেন জব্বলপুর থেকে। ততক্ষণ আপনার অপেক্ষা করা কর্তব্য।

মিঃ লাল অমনি ভড়কে গিয়ে বললেন—ডিটেকটিভ ডিপার্টের লোক আসবে? তার মানে?

ইন্দ্রনাথ বললেন—হ্যাঁ। আমি টেলিফোন করে এসেছি কর্ণেলের কথায়।

মুখ বিকৃত করে মিঃ লাল বললেন—ভাল করেছেন! এবার দেখুন মশা মারতে কামান দেগে কী অবস্থা হয়। সব জড়িয়ে পড়বেন মাইণ্ড দ্যাট! একজন জোচ্চোরের কথায় আপনি……

বাধা দিয়ে বললুম—মিঃ লাল, আবার আপনি অন্যায় করছেন। ওঁকে এসব কদর্য কথা বলার জন্যে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে।

এবার মিঃ লাল আর গর্জালেন না। গম্ভীর মুখে বললেন—আপনিও ভাববেন না যে জার্নালিস্ট বলে আপনি বেঁচে যাবেন। ইয়েস—লেট দেম কাম। কিন্তু ততক্ষণ এই লোকটা আর আপনি দুজনেই এই ঘরে বসে থাকুন। ইউ আর আণ্ডার এ্যারেস্ট।

কর্ণেল আমাকে চোখ টিপলেন। হাসি টিপে বললুম—বেশ। কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছেন, উনি বুড়োমানুষ। ওভাবে হাত তুলে কতক্ষণ থাকবেন ?

মিঃ লাল ধমক দিয়ে বললেন—হ্যাণ্ডস ডাউন।

ঘরের ভেতর বসে নিঃশব্দে আমরা ভোরের প্রতীক্ষা করতে থাকলুম। তখন রাত চারটে বেয়াল্লিশ। বৃষ্টি সমানে পড়ছে।……

ভোরেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। মিঃ লাল টেবিলের বাতির সামনে সেই কালো নোটবই পড়ছিলেন আর মাঝেমাঝে আমাদের দিকে ঘুরে তাকাচ্ছিলেন। দুজন সেপাই দরজায় বন্দুক বাগিয়ে পাহারা দিচ্ছিল। কিন্তু অবাক লাগল, শর্মা এবং ইন্দ্রনাথ এ ঘর ছেড়ে আর শুতে যান নি। দুটি লুব্ধ জন্তুর মতো মিঃ লালের নোটবইটার দিকে তাকিয়ে ঠায় বসে থাকলেন। আমরা দুজন তো মিঃ লালের বন্দী, তাই ঘর ছাড়ার প্রশ্ন ওঠে না। বেচারা কর্ণেলের জন্য দুঃখ হচ্ছিল। ওঁর হাতির বরাত. এমন মশা বনে যেতে কখনও দেখি নি! চালে ভুল করেই এই দুর্দশায় পড়েছেন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ মিঃ লালের খপ্পরে এভাবে পড়ে যাবেন, ভাবেন নি। ভাবছিলুম,

কর্ণেলকে যথেষ্ট বকে দেব। নির্ঘাৎ এবার ওঁকে বাহাত্তুরে ভীমরতি ধরেছে! এভাবে সেখানে যা খুশি করে ফেলে নিজেও বিপদে পড়বেন —আমাকেও ফেলবেন। কোন মানে হয় না!

কিন্তু ওর মুখটা নির্বিকার। মিটিমিটি হাসছেন আর হাসছেন। কী চেহারা রে বাবা!

সবে পুবের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে, মিঃ লালের পড়া শেষ হল। নোট বইটা বুজিয়ে কর্ণেলের দিকে ঘুরলেন। বললেন—হুঁ, বোঝা গেল শ্রীমান চারশো বিশের আগমনের উদ্দেশ্য। ইন্দ্রনাথ বাবু, মিঃ শর্মা! আপনাদের সাক্ষ্যের ওপর সব নির্ভর করছে—মাইণ্ড ছাট।

ইন্দ্রনাথ বললেন—মিঃ লাল, কী লেখা আছে ওতে বলবেন কি?

মিঃ লাল কী বলতে যাচ্ছিলেন, কর্ণেল বাধা দিলেন।—মিঃ লাল, আবার আপনাকে, আমি সতর্ক করে দিচ্ছি। ওই ডাইরি বইটা সৌম্যেন্দুর হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে একটা মূল্যবান দলিল।

মিঃ লালের ঠোঁট ফাঁক হল, কিন্তু কথা বেরুবার আগেই দরজা খুলে ফের সর্বেশ্বরী বেরুলেন। মনে হল, বৃদ্ধা এতক্ষণ ঘুমোন নি। জেগেই ছিলেন। বললেন—মিঃ লাল, ওই ডাইরিটার কথা আমি জানতুম। ওটা আমার স্বামীর ডাইরি। ওতে কী আছে, তা আমার স্বামী অবশ্য কখনও জানান নি—জানতেও চাই নি। এখন মনে হচ্ছে, ওর মধ্যে এমন কিছু আছে—যার জন্য সৌমেন্দুর প্রাণ দিতে হল। ওটা কি আমাকে একবার দেখতে দেবেন?

মিঃ লাল কর্ণেলের মুখের দিকে তাকিয়ে দ্বিধাজড়িত স্বরে বললেন —কিন্তু এটা এখন আদালতের একজিবিট হবার যোগ্য। তাই আপনাকে দেখানো যাবে কি?

কর্ণেল বললেন—ওকে একবার পড়তে দিতে আমার আপত্তি নেই। কারণ উনিই এই হত্যাকাণ্ডের মামলার প্রধান সাক্ষী হবেন।

—আপনি থামুন! বলে মিঃ লাল সর্বেশ্বরীর দিকে ঘুরলেন। —মিসেস রায়, এটা আমার হাতেই থাকবে। আপনি এখানে এসে পড়ে দেখুন।

সর্বেশ্বরী এগিয়ে গিয়ে টেবিলের পাশে দাঁড়ালেন। মিঃ লাল ডাইরিটা খুলে ধরলেন। কয়েক পাতা পড়ার পরই সর্বেশ্বরীর মুখে অদ্ভুত ভাবান্তর লক্ষ্য করলুম। মনে হল, উনি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। ঠোঁট কামড়ে ধরেছেন। আমরা সবাই চুপচাপ ওর দিকে তাকিয়ে আছি।

পড়া শেষ হলে সর্বেশ্বরী কর্ণেলের দিকে ঘুরে বললেন—কর্ণেল সরকার! আপনি কিভাবে এটার খোঁজ পেলেন বলবেন কি?

কর্ণেল বললেন—বলতে আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে দয়া করে আমার প্রশ্নের জবাব দিন। C^2 এই সংকেতটি কি আপনার পরিচিত?

সর্বেশ্বরী ভুরু কুঁচকে বললেন—হ্যাঁ। কেন?

—এর অর্থ কি আপনি জানতেন?

—না। কারণ, আমার স্বামী এর অর্থ আমাকে জানান নি। তিনি বেশ কয়েকদিন আমাকে বলেছিলেন—যদি আমি হঠাৎ মারা পড়ি, তুমি C^2 এই কথাটা মনে রাখবে এবং সৌম্যেন্দুকে জানাবে। ওর সব কথাই ওই রকম হেঁয়ালিতে ভরা থাকত। ভাবতুম ড্রিঙ্কের ঘোরে আবোল তাবোল বকছেন।

—হুম। সৌম্যেন্দুকে আপনি জানিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। ওর মৃত্যুর পর জানিয়েছিলুম। সৌম্যেন্দু হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। বলেছিল—কাকামশাইয়ের পাগলামি!

কর্ণেল ইন্দ্রনাথকে জিগ্যেস করলেন—আপনি এর আগে C^2 কথাটা শুনেছিলেন?

ইন্দ্রনাথ গম্ভীরমুখে বললেন—না। এখানে আসার পর বঁড়শীর মোড়কে লেখা দেখেছিলুম।

কর্ণেল সর্বেশ্বরীকে বললেন—মিসেস রায়, লুকোবার কারণ নেই! এবার বলুন তো, আপনিই ইন্দ্রনাথ বাবুর বঁড়শীর মোড়ক বদলে C² লেখা ডাইরির একটা পাতা ও ঘরে রেখেছিলেন কি না?

সর্বেশ্বরী মুখ নামিয়ে জবাব দিলেন—হ্যাঁ। আমার স্বামী যেদিন মারা যান, সেদিনই আনমনে কথাটা অন্য একটা ডাইরির পাতায় আমি লিখেছিলুম। ইন্দ্রনাথ এবার এখানে আসার পর আমার সন্দেহ হল যে নিশ্চয় একটা কিছু ঘটতে চলেছে—যার কোন কিছু আমি জানি না। তাই ওই পাতাটা ওর নজরে এনে দেখতে চেয়েছিলুম, ও কী করে।

ইন্দ্রনাথ শুকনো হেসে বললেন—অবাক হয়েছিলুম তারিখটা দেখে। কিন্তু ওই কথাটার মানে কী, আমি তো জানতুম না। এখনও জানি না।

কর্ণেল মিঃ শর্মার দিকে ঘুরে বললেন—আপনি কিছু জানতেন?

শর্মা অন্যমনস্ক ছিলেন যেন। চমকে উঠে মাথা দোলালেন। ওদিকে মিঃ লাল এতক্ষণ চুপচাপ সব শুনছিলেন। এবার হাত নেড়ে বললেন—খুব হয়েছে! এটা আদালত নয় এবং ওই বুড়ো টেকো দাড়িওয়ালাটাও সরকারী কৌঁসুলী নয়। সে অধিকার আমি ওকে দিই নি।

সেই সময় বাইরে জিপের গর্জন শোনা গেল। তখন সূর্যের হাল্কা আলো এসে লন পেরিয়ে বারান্দা ছুঁয়ে ঘরে ঢুকছে। দুটো জিপ দেখা গেল লনে। তারপর কজন পুলিশ অফিসার এবং দুজন সিভিলিয়ানের পোশাক পরা ভদ্রলোক জিপ থেকে নেমে বারান্দায় উঠলেন। একজন ঢুকতে ঢুকতে বললেন—কই? কোথায় আমাদের মাননীয় কর্ণেল সাহেব?...ও হ্যাল্লো! হ্যাল্লো! হ্যাল্লো!

আমি অবাক হলুম না। মিঃ লাল ভীষণ অবাক হলেন নিশ্চয়। কর্ণেলের হাত ধরে সেই ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন—একি কর্ণেল সরকার! আপনার এ অবস্থা কেন?

কর্ণেল স্মিত হেসে বললেন—ও কিছু না মিঃ আচারিয়া! ও কিছু না! আপনি কেমন আছেন? ইস! দীর্ঘ ছ সাত মাস পরে দেখা। তাই না?

মিঃ আচারিয়া তখনও অবাক। আমি এবার মিঃ লালের কীর্তি ফাঁস করতে যাচ্ছি, টের পেয়েই কর্ণেল আমার হাত ধরে বললেন—মিঃ আচারিয়া, আগে আলাপ করিয়ে দিই আমার এই তরুণ বন্ধুর সঙ্গে। জয়ন্ত চৌধুরী—কলকাতার প্রখ্যাত সংবাদপত্র দৈনিক সত্যসেবকের রিপোর্টার। জয়ন্ত, ইনি আমার এক বন্ধু—ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মিঃ চন্দ্রমোহন আচারিয়া।

আড়চোখে তাকিয়ে দেখি মিঃ লাল ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছেন এবং সূর্যোদয়ই দেখছেন হয়তো।

হঠাৎ সর্বেশ্বরী বলে উঠলেন—আপনারা বসুন, প্লীজ। আমি আপনাদের কফির ব্যবস্থা করি। কেউ কিছু বলার আগেই বৃদ্ধা কিচেনের দিকে চলে গেলেন।···

ডাইরিতে কী লেখা ছিল, পরে জেনেছিলুম। কিন্তু ঘটনা আগাগোড়া সাজানোর খাতিরে সেটা এখানেই দেওয়া হল। সংক্ষিপ্তভাবেই বলছি:

জগদীপ রায় একবার বোম্বাইয়ের এক পানশালায় হিগিনস নামে একজন প্রাক্তন ব্রিটিশ যোদ্ধার সঙ্গে পরিচিত হন। হিগিনস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লেফটন্যান্ট মেজর ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার পরও তিনি এদেশে থেকে যান এবং অবসর নেন। হিগিনস বেজায় মদ্য খেতেন। সেই পানশালায় জগদীপের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সময় তখন ওঁর প্রচণ্ড মাতাল অবস্থা। তখন জগদীপ ওঁকে ওঁর বাসায় পৌঁছে দিতে যান। হিগিনস ব্যাচেলার ছিলেন। যাইহোক, গাড়িতে নিয়ে যাবার সময় এবং বাসায় গিয়ে নেশার ঘোরে এমন কিছু কথা বলেন, জগদীপের তাক লেগে যায়।

হিগিনস যুদ্ধের সময় মধ্যপ্রদেশের এই এলাকার এক রাজপ্রাসাদে ছিলেন। বলা বাহুল্য বাড়িটি এক দেশীয় রাজার এবং তা ব্রিটিশ সরকার সেনানিবাস হিসেবে ব্যবহার করার জন্য দখল করে নেন। সেই বাড়িতে যেভাবেই হোক, হিগিনস এবং তিনজন সহযোদ্ধা মিলে একটি বাকসো পেয়ে যান। বাকসে সোনাদানা হীরে জহরত ছিল বোঝাই হয়ে। এই গুপ্তধন পাওয়ার পর সমস্যা দেখা দেয়। সবার চোখ এড়িয়ে এগুলো ভাগাভাগি করা কঠিন। কারণ সেনানিবাসে সব সময় ভিড়। তাছাড়া কাকে কোন মুহূর্তে কোথায় পাঠানো হবে, ঠিক নেই। ধনসম্পদের ভাগ নিয়ে রাখবেন কোথায়? চার বন্ধু মিলে এই চিরিমিরি জঙ্গলে এসে লেকের পশ্চিম উপত্যকায়—যেখানে পরে সীসের খনি খোঁড়া হয়, সেখানে পুঁতে রাখেন। কথা রইল—যুদ্ধ শেষ হলে ওটা ভাগাভাগি করে নেওয়া হবে। ঘটনাচক্রে বর্মা ফ্রনটে হিগিনস বাদে সবাই মারা পড়েন। হিগিনস ফিরে এসে গুপ্তধনের খোঁজ করেন। কিন্তু তিনবছরের মধ্যে এক ভূমিকম্পে উপত্যকার মাটি ওলটপালট হয়ে গেছে। ফলে হিগিনস খুঁজে বাকসোটা বের করতে পারেন নি। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসকরা চলে গেলেন। কিন্তু বাধ্য হয়ে হিগিনসকে থাকতে হল। এখন তাঁর একমাত্র কাজ, বারবার চিরিমিরি উপত্যকায় যাওয়া এবং অনুসন্ধান।

গুপ্তধনের প্রতি মানুষের প্রচণ্ড নেশাধরানো লোভ আছে। জগদীপ সেই লোভে পড়ে গেলেন এবং গোপনে একা তল্লাস শুরু করলেন। কিন্তু বারবার ওখানে শিকার কিংবা ছিপে মাছধরার অজুহাত কাঁহাতক দেখানো যায়। বিশেষ করে ক্রমাগত সপ্তাহ কিংবা, মাসও লেগে যেতে পারে। অতএব উনি ফন্দি আঁটলেন। অনন্তরাম শর্মা ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং খনি ইঞ্জিনিয়ার। ওই উপত্যকায় কোন খনিজ সম্পদ থাকা সম্ভব বলে মনে হয়েছিল জগদীপের। ওঁর ভাগ্য ভাল—শর্মা মাটি পরীক্ষা করে জানালেন, তলায় সীসের খনি আছে।

জগদীপ ভুপালের নবাবের কাছে বন্দোবস্ত নিলেন জায়গাটার। খনির কাজ শুরু হল। কিন্তু সেই গুপ্তধনের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।……

এরপর জগদীপের নিজের ভাষায় ডাইরির শেষাংশ তুলে দিচ্ছি। তারিখ—১৬ আগস্ট। অর্থাৎ ওঁর মৃত্যুর আগের দিন।

…আজ আমি জীবনের এক ভয়ঙ্করতম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলুম। শেষ তিনটি পিট সাবধানতার জন্য বুজিয়ে দেওয়া দরকার। তাই শর্মাকে নিয়ে বেরিয়েছিলুম। শর্মা কিছুক্ষণ পরীক্ষার পর মাছ ধরতে গেল লেকে। আমি বিষণ্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এতগুলো বছর আমার বৃথা চলে গেল। এবার ব্যর্থতার বোঝা মাথায় নিয়ে এই উপত্যকা ছেড়ে চলে যেতে হবে।

…আনমনে বড় সুড়ঙ্গের কাছে যেই গেছি, হঠাৎ দেখি এক আজব মূর্তি। প্রথমে চিনতে পারি নি—পরক্ষণে চিনলুম। হিগিনস। কিন্তু এ কী মূর্তি তার! মাথায় একরাশ চুল, মুখে দাড়ি গোঁফের জঙ্গল, পরণে মাত্র একটা ছেঁড়া হাফপ্যান্ট—হাতে বড়বড় নখ, সারা গা নোংরা—খালি পা—সে আমাকে দেখামাত্র অমানুষিকভাবে হেসে উঠল। ও নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছে! শিউরে উঠলুম ওর পরিণতি দেখে।…তাহলে কি একদিন আমারও ওই পরিণতি ঘটবে?

…হঠাৎ হিগিনস জন্তুর মতো গর্জন করে আমাকে তেড়ে এল। পকেট থেকে পিস্তল বের করে ছুঁড়লুম। গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল। হিগিনস অমনি ঘুরে সুড়ঙ্গে গিয়ে ঢুকল। আমার মধ্যে তখন খুনের নেশা জেগেছে। সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়লুম। আন্দাজে গুলি ছুড়লুম পাগলের মতো। মনে হল হিগিনস হাসছে কোথায়। কানের ভুল হতেও পারে।…

…ঠিক করেছি, হিগিনসকে শেষ করতেই হবে। আগামীকাল টর্চ নিয়ে ওই সুড়ঙ্গে ঢুকব। ওকে খুঁজে বের করে হত্যা করব। ও আমার এই লোভের জন্য দায়ী। ও আমার জীবনের সুখশান্তি নষ্ট

করার মূলে। আজ আমার চোখে শুধু হীরেপান্না-জহরতের ঝলমলানি। এ কী অদ্ভুত অভিশাপ! খেতে ঘুমোতে সবসময় ওই গুপ্তধন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ঘুমোতে পারিনে—খাওয়া ফেলে উঠে পড়ি। আমার জীবনীশক্তি দিনে দিনে শেষ হয়ে যাচ্ছে। শয়তান হিগিনসই এর জন্যে দায়ী……'

বেশ বোঝা যায়, ১৭ আগস্ট হিগিনসকে হত্যার উদ্দেশ্যে জগদীপ সুড়ঙ্গে ঢোকেন এবং সম্ভবত হার্টফেল করে মারা পড়েন। ওই মানসিক অবস্থায় এটা স্বাভাবিক ছিল।

সেই সঙ্গে বোঝা গেল সর্বেশ্বরী যে সাধুর কথা বলেন, সে কে। কিন্তু হিগিনস কি এখনও বেঁচে আছেন এবং সুড়ঙ্গে থেকে অভিশপ্ত গুপ্তধন খুঁজে বেড়াচ্ছেন?

আর 'C^2' কথার অর্থ কি, কর্ণেল আমাকে জানিয়েছেন। ওটা দুর্বোধ্য কিছু নয়। ক্যাবিনেট নম্বর টু। ডাইনিংয়ের দেয়াল আলমারির দু-নম্বর খোপ। কর্ণেল নিছক অনুমানের ভিত্তিতে কাজে নেমেছিলেন এবং অনুমানটা মিথ্যে হয় নি।

আচারিয়া কর্ণেলের দুর্দশার কথা শুনে হেসে খুন। ততক্ষণে মিঃ লাল পুরোপুরি বদলে গেছেন এবং কর্ণেলের উদ্দেশ্যে বারবার বলছেন—খুব দুঃখিত। কিন্তু স্যার, আমার কর্তব্যজ্ঞানই এ জন্য দায়ী। কর্ণেল মিঃ লালের একটা হাত সস্নেহে টেনে নিয়ে তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি, সাহস এবং দক্ষতার প্রশংসা করার পর দেখা গেল, দুজনে পাশাপাশি হাঁটছেন, বসছেন। কর্ণেলের এ সব ব্যাপারে জুড়ি নেই। সব অপ্রীতিকর মুহূর্ত ঘুচিয়ে দিতে তিনি পটু। অতএব, আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছি।

কর্ণেল এবং পুলিশ অফিসাররা সবাই ঘাট ঘুরে খনি উপত্যকায় চলে গেলেন। রাতে ভাল ঘুম হয় নি—তাই আমার ক্লান্তি লাগছিল। ভাবলুম ওঁরা তদন্ত করুন—আমি একটু গড়িয়ে নিই।

গড়াচ্ছি, হঠাৎ কানে এল সর্বেশ্বরী ও ইন্দ্রনাথ পাশের ডাইনিংয়ে

উত্তেজিতভাবে কথা বলছেন। উঠে বারান্দায় গেলুম। তখন এ্যামবুলেন্স এসে গেছে। একটু পরে লাশ নিয়ে যাওয়া হবে। সেপাইরা এবং এ্যামবুলেন্সকর্মীরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। মিঃ শর্মাকে দেখতে পেলুম না কোথাও। অথচ উনি কর্ণেলদের সঙ্গেও যান নি শরীর খারাপ বলে নিজের ঘরে ঢুকেছিলেন। সেই ঘরের দরজা খোলা এবং বিছানা শূন্য দেখা যাচ্ছে। বারান্দা থেকে ডাইনিংয়ের দরজা দিয়ে সেটা আমার চোখে পড়ছিল।

সর্বেশ্বরী তাঁর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। ইন্দ্রনাথ একটু তফাতে। আমি একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকলুম।

সর্বেশ্বরী। তুমি দেব-দেবতা ভগবান—যার নামই নাও, আমি ও কথা বিশ্বাস করি না।

ইন্দ্রনাথ। আপনার বিশ্বাস করা না করায় আমার কিছু যায় আসে না।

সর্বেশ্বরী। হ্যাঁ তা তো বটেই। এখন ওকথা বলবে বইকি। মানুষ হয়ে গেছ—এখন তো আর আমার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু জেনে রাখো, আমার একটি পয়সাও তুমি আশা কোরো না।

ইন্দ্র। নিশ্চয় করি না। আপনার সম্পত্তি যা খুশি করুন, আমি কিছু বলতে চাইনে। কিন্তু দোহাই আপনার, ওই মিথ্যে বদনাম দেবেন না।

সর্বেশ্বরী। একশো বার দেব। সাধুবাবা স্বয়ং আমাকে বলে গেলেন। ফাইলটা তুমিই হাতিয়েছ।

• ইন্দ্র। (বিকৃত হেসে) সাধুবাবা! আপনার ওসব গাঁজাখুরি ব্যাপারে আমার কোনদিন বিশ্বাস ছিল না—এখনও নেই।

সর্বেশ্বরী। (ক্ষেপে গিয়ে) আমি এ ঘর থেকে তোমার পায়ের শব্দ পেয়েছিলুম কাল বিকেলে। উঠে এসে দেখি, তুমি ঝোপের মধ্যে চলে যাচ্ছ।

ইন্দ্র। আপনি পায়ের শব্দ বুঝতে পারেন?

সর্বেশ্বরী। নিশ্চয় পারি !

ইন্দ্র। তাহলে শুনুন, যাকে দেখেছিলেন সে সৌম্য। আমি তাকে ফলো করে এসেছিলুম। ঝোপের আড়াল থেকে দেখলুম—সে এঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার হাতে কী একটা ছিল—দূর থেকে বুঝতে পারলুম না।

সর্বেশ্বরী। আমি বিশ্বাস করি না।

ইন্দ্র। আপনার পা ছুঁয়ে বলব ?

সর্বেশ্বরী। না—আমার পায়ে হাত দেবে না। নিজের ছোট ভাইকে খুন করেছে যে, তাকে……

ইন্দ্র। (আর্তস্বরে) কাকিমা ! ওকে আমি খুন করি নি।

সর্বেশ্বরী। নিশ্চয় করেছ ! যদি তোমার ওই কথাটা সত্যি হয় যে ফাইলটা সৌম্য নিয়ে যাচ্ছিল ; তাহলে ওটা হাতাতে তুমিই খুন করেছ।

ইন্দ্র। (ভাঙ্গা স্বরে) না না ! ফাইলে কী ছিল আমি এখনও জানি না !

সর্বেশ্বরী। তুমি ন্যাকা !

এইসময় দূরে কোথাও গুলির শব্দ শোনা গেল। চমকে উঠলুম। ফের কয়েকবার শব্দ হতেই একটা হুলুস্থূল পড়ে গেল। সিপাইরা দৌড়ে ঘাটের দিকে গেল। ইন্দ্রনাথও বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখেই জিগ্যেস করলেন—কী হল জয়ন্তবাবু ?

মাথা নেড়ে দৌড়ে গেলুম ঘাটের দিকে। গিয়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলুম। লেকের জলে অনন্তরাম শর্মা গলাঅব্দি ডুবে রয়েছেন—দুহাত ওপরে তোলা। সবাই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মিঃ আচারিয়া চিৎকার করছেন—উঠে আসুন বলছি। এক মিনিটের মধ্যে উঠে না এলে আবার গুলি ছুঁড়ব।

শর্মা আর্তনাদ করে বললেন—উঠছি। দোহাই ! গুলি ছুঁড়বেন না। উনি এবার দুহাত তুলে ঘাটের দিকে আসতে থাকলেন। কর্ণেল

একটু দূরে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছিলেন। কাছে গিয়ে বললুম—এই নাটকের অর্থ কী কর্ণেল?

কর্ণেল বললেন—তুমি এখনও নাবালক, জয়ন্ত। বুঝতে পারছ না কিছু।

—কী সর্বনাশ! শর্মাই কি সৌম্যেন্দুকে খুন করেছেন?

—হ্যাঁ।

—সে কী! কেন?

—হিগিনসের একটা ফাইল হাতাতে। চলো, বাংলোয় গিয়ে সব বলছি।……

ফাইলটার কথা একটু আগে সর্বেশ্বরী ও ইন্দ্রনাথের ঝগড়ার মধ্যে শুনেছি। বাংলোয় ফিরে বাকিটা শুনলুম বিশদ ব্যাখ্যা সহ। সর্বেশ্বরীও সব ফাঁস করে দিলেন।

হিগিনসই সর্বেশ্বরীর সাধুবাবা। কদিন আগে কলকাতা গিয়ে সর্বেশ্বরীকে একটা ছোট ফাইল দিয়ে আসেন। ইন্দ্রনাথ ব্যাপারটা টের পান। কিন্তু এর রহস্যটা কী জানতেন না। তাই কর্ণেলের শরণাপন্ন হন। আশ্চর্য, বুড়ো ঘুঘু আমাকেও কিছু খুলে বলেন নি। যাইহোক, হিগিনস দেশে ফিরে গেছেন। গুপ্তধনের মায়া ত্যাগ করেই গেছেন। ওর ফাইলে উপত্যকার একটা ম্যাপ ছিল—১৯৪৩ সালের ম্যাপ। ম্যাপে গুপ্তধনের অবস্থান চিহ্নিত ছিল। কিন্তু ১৯৪৬-এর ভূমিকম্পে সব ওলটপালট হয়ে যায়। তাই হিগিনস বছরের পর বছর খোঁজাখুঁজি করেও পাত্তা পান নি। তাছাড়া বোঝাই যায়, ওর ক্রমশ মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছিল। তা না হলে হয়তো বের করা অসম্ভবও হত না। জগদীশ তখন ফাইলটা পেলে নিশ্চয় হদিশ করতে পারতেন। এখন সর্বেশ্বরীর ভুল হল—ফাইলের কথাটা শর্মাকে জানানো। শর্মা তক্কেতক্কে ছিলেন। সর্বেশ্বরী এখানে আসার পর ফাইলটা সতর্কতা হিসাবে সৌম্যেন্দুর বিছানার তলায় রেখে দেন।

কারণ, শর্মার মতিগতির ওপর ক্রমশ তাঁর সন্দেহ জাগছিল।

কর্ণেল ও শর্মা চলে যাবার পর সর্বেশ্বরী রঘুবীরকে দিয়ে সৌম্যেন্দুকে ডাকতে পাঠান। সৌম্যেন্দু আসতে দেরী করে। সম্ভবত মাছে টোপ খাচ্ছিল তখন। সে একটু পরে এলে সর্বেশ্বরী তাকে বলেন, বিছানার তলায় যেটা আছে—সেটা সে যেন সাবধানে লুকিয়ে রাখে। কারণ, ওটা একটা দামী দলিল।

সৌম্যেন্দু দলিলের ফাইলটা নিয়ে চলে যায়, সে ঘাটে বসে পড়ে দেখার কথা ভেবেছিল। ওদিকে কর্ণেল ও শর্মা গর্তগুলোর অন্যমুখ খুঁজছেন। ওই সময় এক ফাঁকে কর্ণেলের অজানতে শর্মা ফাইল চুরি করতে চলে আসেন। অভাবিত সুযোগ। সর্বেশ্বরী তখন একা আছেন। দরকার হলে তাঁকেও খুন করে ওটা হাতাবে। কিন্তু সৌম্যেন্দুর দুর্ভাগ্য, ঘাটে তখন ফাইলটা পড়ছে। শর্মা আগেই কিচেনের ছুরিটা হাতিয়েছিলেন। তাই দিয়ে সৌম্যেন্দুকে খুন করেন। ফাইলটা কেড়ে নেন। জঙ্গলে পাথর চাপা দিয়ে রেখে ভালমানুষের মতো কর্ণেলের সামনে আবির্ভূত হন।

ইন্দ্রনাথ তার একটু আগে সৌম্যেন্দুকে বাংলোয় যেতে দেখে অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু ফাইলটা যে সৌম্যেন্দু নিয়ে আসছে, বুঝতে পারেন নি। নিজের ঘরে ঢুকে দেখে আসেন সৌম্যেন্দু বরাবরকার মতো তাঁর জিনিসপত্র হাতড়াচ্ছে কিনা। তাঁর শ্যাওলভরা জুতোর দাগ আমরা ঘরের মেঝেয় দেখেছি। কালো দাগগুলো শর্মার। শর্মা সৌম্যেন্দুকে খুন করার পর ও ঘরে একবার ঢোকেন। কারণ, সর্বেশ্বরীর মোড়ক বদলানোটা তাঁরই পরামর্শে। ইন্দ্রনাথের রি-অ্যাকশন জানা। যখন দেখলেন, ইন্দ্রনাথের নজরে মোড়কটা এসেছে এবং সযত্নে রাখা আছে—উনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ওটা দলা পাকিয়ে ফেলে দেন। তখন খুন করার পর ওর বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়েছে। ফাইলটাও লুকোতে হবে। কিন্তু নিজের ঘরে গেলে সর্বেশ্বরীর চোখে পড়বে। তাই তক্ষুণি বেরিয়ে উপত্যকার দিকে চলে

যান। ওদিকে কর্ণেলও তাঁর দেরীতে সন্দিগ্ধ হতে পারেন।

ইন্দ্রনাথ কিন্তু বারংবার ঘাট থেকে উঠে বাংলোর দিকটা দেখছিলেন। অর্থাৎ লক্ষ্য রেখেছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ে, শর্মা চলে যাচ্ছেন। যদি ইন্দ্রনাথ সৌম্যেন্দুর ঘাট হয়ে যেতেন. তাহলে হয়তো পাশের ঝোপে লাশ পড়ত। কিন্তু সৌম্যেন্দুর চোখে পড়ার ভয়ে তিনি আরও ওপর দিয়ে শর্মাকে অনুসরণ করেন। উঁচু থেকে দেখতে পান, শর্মা কী একটা পাথরের তলায় পুঁতে রাখছেন। গতরাতে সেটা খুঁজতেই গিয়েছিলেন। পান নি।

আজ সকালে অবশ্য ফাইলটা কর্ণেলরা উদ্ধার করেছেন। কিন্তু ম্যাপটা নেই। ওটা শর্মার পকেটস্থ হয়েছিল। কাজেই লেকের জলে ভিজে দুমড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। কালি বেরিয়ে গেছে। অতএব গুপ্তধন মানুষের চোখের আড়ালেই থেকে গেল।......

কর্ণেলের মাথায় কখন কোন মতলব গজিয়ে ওঠে, আগে থেকে তার আঁচ পাওয়া ভারি কঠিন। এক উৎকট গ্রীষ্মের সকালে তাই যখন তাঁর তলব পেলুম, আজই দুপুরের ফ্লাইটে গৌহাটি রওনা হতে হবে এবং আমি যেন তৈরি হয়েই বেরোই—একটুও অবাক হই নি।

এই বুড়ো দাড়িওলা টেকো লোকটিকে প্রশ্ন করলে সব সময় জবাব মেলে না। তাই গৌহাটি পৌঁছানো অব্দি কোন প্রশ্ন করি নি। দেখেছি, প্লেনে ওঁর হাতে একটা মোটা ইংরেজি কেতাব এবং তার পাতায় বুঁদ হয়ে আছেন। বইটার নাম: দি 'প্রি-হিসটোরিক এ্যানিম্যালস অফ ইনডিয়া।'

গৌহাটিতে আমরা একটা প্রাইভেট লজে উঠলুম। বুড়ো আগে থেকেই দেখলুম ব্যবস্থা করে রেখেছেন। লজের মালিক হংসধ্বজ সান্যাল। পঞ্চাশের এদিকেই বয়স। শক্ত সমর্থ গড়নের মানুষ। একটু গম্ভীর চালচলন। পোড়খাওয়া চামড়া গায়ে। তিনটে চা বাগিচার মালিক নাকি উনি। বিমানঘাঁটি থেকে আমাদের গাড়ি করে নিয়ে গেছেন।

কর্ণেল চমৎকার সাজানো বসার ঘরে একটা ইজিচেয়ারে হাত পা ছড়িয়ে বসে অস্ফুট একটা আরামের আওয়াজ তুললেন—আঃ! তারপর বললেন—মিঃ সান্যাল, আপনার পার্টনার ভদ্রলোক কি এখনও আসেন নি?

হংসধ্বজ বললেন—আগরওয়াল? এসে পড়বে নেক্সট ফ্লাইটে। তারপর আশেপাশের অবস্থা দেখে নিয়ে একটু হেসে আবার বললেন—সন্ধ্যা ছটায় ল্যাণ্ড করবে। ঝড়জলের সম্ভাবনা দেখছি না আজ।

আগরওয়ালের পয় আছে।

ঘড়িতে তখন বিকেল তিনটে। আমরা লাঞ্চ সেরেই কলকাতা থেকে বেরিয়েছি। তবু সান্যাল সায়েব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন অতিথি সৎকারে। সেই ফাঁকে কর্নেলকে এতক্ষণে প্রশ্ন করে ফেললুম—হ্যালো ওল্ড বস! ব্যাপারটা কী?

কর্নেল চোখ বুজে কী যেন ভাবছিলেন। চোখ খুলে বললেন—তুমি কি কিছু বলছ জয়ন্ত, ডার্লিং?

খচে গিয়ে বললুম—না।

কর্নেল হেসে উঠলেন। তারপর আমার চোখের দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন—জয়ন্ত তুমি তো খবরের কাগজের লোক। একজন স্পেশাল রিপোর্টার। দৈনিক সত্যসেবক তোমাকে···

বাধা দিয়ে বললুম—আমাকে মাসে দেড়হাজার টাকা মাইনে দিয়ে পুষছে। তাতে আপনার কী? আপনিও তো মিলিটারি সার্ভিসে কমসে কম হাজার দুই পেতেন শুনেছি!

কর্নেল কিন্তু একইভাবে তাকিয়ে বললেন—জয়ন্ত, ইয়েতি কাকে বলে জানো নিশ্চয়? হিমালয় পর্বতমালার এই রহস্যময় প্রাগৈতিহাসিক দানবের খবর মাঝেমাঝে তোমাদের কাগজেও বেরিয়েছে। সম্প্রতিও বেরিয়েছে। আশা করি তা লক্ষ্য করেছ। জয়ন্ত, রিপোর্টার হিসেবে এবার একটা দারুণ রকমের সুযোগ তুমি পেয়ে যাচ্ছ। ইয়েতির ওপর একটা অনবদ্য কভারেজ দৈনিক সত্যসেবকে এক্সক্লুসিভলি বেরোলে কী ব্যাপার ঘটবে, টের পাচ্ছ কি? তোমার মাইনে তো বাড়বেই—উপরন্তু ম্যাগসেসে পুরস্কার প্রাপ্তিও ঘটতে পারে। সুতরাং বৎস, দয়া করে মাথাটা ঠাণ্ডা করো।

আমি থ ততক্ষণে। হ্যাঁ করে তাকিয়ে থাকলুম বুড়োর দিকে।

কর্নেল বললেন—সম্প্রতি এই পূর্বাঞ্চলে অরুণাচল প্রদেশের চৌখাম আদিবাসীরা দুটো অদ্ভুত প্রাণীকে প্যাকড়াও করেছে। এই

জঙ্গল লোহিত জেলার পাহাড়ী এলাকার থামতি উপত্যকায় রয়েছে।

এবার মুখ খুললুম। —হ্যাঁ। আমরা বক্স করে সে খবর ছেপেছি। দশফুট উঁচু ছুটো জানোয়ার—দেখতে অবিকল নাকি মানুষের মতো। একটা পুরুষ, অন্যটা স্ত্রী। বিশেষজ্ঞরা তাদের পরীক্ষা করে দেখছেন। কেউ বলছেন, এক জাতের গেরিলা—কেউ বলছেন, একরকম ভালুক। কারো মতে এরাই হচ্ছে সেই ইয়েতি বা তুষার দানব। কোন কারণে তুষার এলাকা থেকে চলে এসেছিল।…

—ছ্যাটস রাইট, জয়ন্ত। বলে কর্ণেল তাঁর পকেট থেকে একটা কাগজের কাটিং বের করলেন। পড়তে থাকলেন সেটা।… '১৯০৯ সালে জুগন হিমল থেকে টম স্লিক এভারেস্টের পূর্বে তিনশো মাইল এলাকা ইয়েতির খোঁজে তোলপাড় করেন। ককেশাস অঞ্চলে ১৯০৯ সালে এক রুশ অভিযাত্রীদল ইয়েতির খোঁজে বেরিয়ে একটা একশো বছরের পুরনো বিশাল কংকাল আবিষ্কার করেন। রুশ বিশেষজ্ঞদের মতে ককেশাসে এখনও ইয়েতি আছে। ১৯০৯ সালের জুনে থাই-বর্মা-লাওস সীমান্তে মেকং নদীর ধারে ছুটো অতিকায় মনুষ্যাকৃতি প্রাণী দেখা গিয়েছিল। দর্শক ছিল অনেক। প্রাণীরা তাদের দিকে পাথর ছুঁড়েছিল। রেঙ্গুনের এক দৈনিক পত্রিকায় খবরটি বেরোয়।'

বাধা পড়ল সান্যাল সায়েবের কথায়—কর্ণেল, ওতো কাগজের খবর। আমার পাটনার বন্ধু আগরওয়ালসায়েব কী বিবরণ দিয়েছেন আপনাকে জানি না। তবে…

পাল্টা বাধা দিয়ে কর্ণেল গম্ভীর হয়েই বললেন—হ্যাঁ। সেটা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বলা যায়। তাই শুনেই আমি উৎসাহ দেখিয়েছি। সত্যি বলতে কী, ওঁর কথায় এতটুকু গরমিল অথবা সন্দেহ করার মতো কিছু খুঁজে পাই নি মিঃ সান্যাল।

হংসধ্বজ হেসে উঠলেন। বললেন—এবার আমার দিক থেকে ব্যাপারটা শুনুন কর্ণেল। গত ২৫শে মে অরুণাচলের উপজাতি অধ্যুষিত

খামতি এলাকার জঙ্গলে আমি ও আগরওয়াল ক্যাম্প করে দিন-রাত্রিটা কাটাই। আমাদের সার্ভেয়ার টিম পাহাড়ের তলায় খোড়াখুড়ি করছিল। ওখানে সাতশো একর মতো জায়গা আমরা সরকারের কাছে লিজ নিয়েছি। সেখানে সীসের খনি আছে বলে আমাদের ধারণা। যাই হোক, হঠাৎ অনেক রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। নাকে কেমন একটা বিকট গন্ধ লাগে। ফুটফুটে জ্যোৎস্না ছিল। সার্ভেয়ার কুলিকামিনরা আশেপাশে তাঁবুতে ঘুমোচ্ছিল। আমাদের তাঁবুতে পাশাপাশি ছুটো ক্যাম্পখাটে আমি ও আগরওয়াল। গন্ধটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল তাঁবুটার ওপর কোন জন্তু চাপ দিচ্ছে। টর্চ নেব এবং আগরওয়ালকে ডাকব ভাবছি, কিন্তু কোন ফুরসৎ পেলুম না। আচমকা কী একটা জন্তু আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার বুকে বসে সেটা মানুষের মতো তুহাতে আমার গলা টিপে ধরল। দম আটকে গেল। কিন্তু ঝাঁপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়েছিলুম একটু-খানি, সেটা পাশের ক্যাম্পে কেউ কেউ শুনতে পায়। তার ফলে তক্ষুণি হল্লা শুরু হয়। বন্দুকের আওয়াজ করা হয়। ওরা তো জানে না, আমার তাঁবুতেই কী ঘটেছে। আগরওয়াল বোকার মতো দৌড়ে বেরিয়ে যায়। তার পাশেই আমি আক্রান্ত,·ও বুঝতে পারে নি। আমার ধারণা ওই হল্লা ও আওয়াজে ভয় পেয়ে জন্তুটা আমাকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু তাকে বেরিয়ে যেতে দেখে সবার বীরত্ব উবে যায়। আন্দাজ সাতফুট উঁচু—বরফের মতো সাদা উলঙ্গ প্রকাণ্ড ওই মূর্তি দেখলে তা অস্বাভাবিক নয়। যাই হোক, সে যখন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, তখন একজন সার্ভেয়ার গুলি ছোড়ে। আশ্চর্য? দানবটা ঘুরেও তাকায় না। জঙ্গলে উধাও হয়ে যায়। তখন তুঃসাহসী আগরওয়াল তার পিছনে দৌড়ে যায়।

কর্ণেল বললেন—দানবটা বাইরে যাওয়ার পর আপনি কি দেখে-ছিলেন ওটাকে?

হংসধ্বজ বললেন—না। কারণ, আমি বিছানা ছেড়ে উঠতেই

পারি নি। অজ্ঞান হয়ে গিছলুম।

—তবে কেমন করে জানলেন যে ওটা প্রকাণ্ড এবং বরফের মতো সাদা?

—আমার লোকেরা বর্ণনা করেছে।

—হুম! আগরওয়াল সায়েব আমাকে যা বলেছেন—তা আপনার বর্ণনার সঙ্গে এক। উনি কিছুদূর তাড়া করে ফিরে আসেন। পাহাড়ের আড়ালে ওটা অদৃশ্য হয়।

বলে কর্নেল চুরুট বের করে জ্বেলে নিলেন। তারপর ফের বললেন—আগরওয়াল সাহেব ফিরে এসে আপনাকে অজ্ঞান দেখেন। তখন লোকজনকে খুব বকাবকি করেন। তাদের অবশ্য দোষ ছিল না। ওই বিস্ময়কর প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীটা প্রত্যক্ষ দেখে সবাই আতঙ্কে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। সেটাই স্বাভাবিক। আচ্ছা মিঃ সান্যাল, যে সার্ভেয়ার ভদ্রলোক গুলি ছুঁড়েছিলেন, তিনি কি এখনও আছেন এখানে?

হংসধ্বজ মাথা নাড়লেন।—সে একটা দুঃখের ব্যাপার কর্নেল। ভদ্রলোক ওই ভয়ানক প্রাণীটা দেখার পর থেকে কেমন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর চাকরি ছেড়ে চলে যান। খুব অভিজ্ঞ খনিতত্ত্ববিদ ছিলেন। ধাতুবিদ্যায় বিশেষজ্ঞও বটে। কী করি? থাকলেনই না যখন, আটকালুম না। আর শুধু উনি একা নন—সার্ভেয়ার গ্রুপের বাকি সবাই চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছে। এলাকার কুলিকামিনরাও পালিয়েছে। অবশেষে নতুন সার্ভেয়ার গ্রুপ এবং কুলিকামিন সংগ্রহ করেছি আমরা।

আমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলুম ভেতরে ভেতরে। তাহলে সেই রহস্যময় ভয়ঙ্কর দানবের খোঁজেই কর্নেল নীলাদ্রি সরকার এখানে চলে এসেছেন? উত্তেজনা দমন করলুম। 'অরুণাচলে ইয়েতি' নামে একটা সম্ভাব্য রিপোর্টাজ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। দৈনিক 'সত্যসেবকে'র বিক্রিসংখ্যা আবার একদফা বেড়ে যাবে।...

সন্ধ্যায় এসে পৌঁছলেন হরিহর আগরওয়াল। বয়সে হংসধ্বজেরই কাছাকাছি। আয়তনে একটু মোটা এই যা। রংটা ধবধবে ফর্সা। খুব হাসিখুশি মানুষ। দুজনে ছাত্রজীবন থেকেই বন্ধু। চা বাগিচা ও একটা খনিতে দুজনের অংশীদারীত্ব সমান সমান। চমৎকার বাংলা বলতে পারেন আগরওয়াল। অবাঙালী বলে চেনা কঠিন। এসে জানালেন—নতুন সার্ভেয়ার গ্রুপ এবং লোকজন অলরেডি চলে গেছে। কাজ শুরু হয়েছে। শীগ্‌গির পৌঁছানো দরকার। নয়তো তারাও পালাবে।

পরদিন সকালে আমাদের যাত্রা শুরু হল। ট্রেনে লামডিং, ডিমাপুর হয়ে তিনসুকিয়া এবং তারপর ডিব্রুগড়। সেখান থেকে আবার ট্রেনে ডাঙ্গোরি। ডাঙ্গোরি থেকে জিপের ব্যবস্থা করা ছিল। লোহিত নদী পেরিয়ে মদিয়া নামে একটা জায়গায় পৌঁছলুম—সেখানেই সভ্যজগতের সীমানা শেষ হয়েছে। দুটোদিন দুটো রাত কেটে গেল রাস্তায়। মদিয়া থেকে দুর্গম পাহাড় ও জঙ্গল শুরু। রাস্তা বলতে তেমন কিছু নেই। আমাদের জিপ কিন্তু হেলেদুলে নির্ভয়ে চলতে থাকল।

লামতি পৌঁছলুম সন্ধ্যা নাগাদ। তখন শরীর একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। নার্ভও বিপর্যস্ত। কর্ণেল বুড়ো কিন্তু আশ্চর্য নির্বিকার। সারাপথ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা শুনিয়েছেন। এই সব অঞ্চলেই নাকি উনি ছিলেন এবং সব নখদর্পণে। এমন কি অনেক পাহাড়ী সর্দারের সঙ্গে ভাব হয়েছিল—কর্ণেলের বিশ্বাস, দেখলে তারা এখনও চিনতে পারবে।

একটা সুদৃশ্য উপত্যকায় সান্যালসায়েবদের লোকেরা কাজ করছে। ছোট নদী আছে। তার দুধারে নিবিড় জঙ্গল। জঙ্গলের একদিকে খনি খোড়ার এবং মাটি পরীক্ষার কাজ চলছে। তাঁবুগুলো একটা টিলার গায়ে। কাজের চেয়ে হল্লাটা খুব বেশি মনে হল।

সম্ভবত ইয়েতির আতঙ্কে সবাই জড়োসড়ো। এখানে ওখানে আগুন জ্বালানো হয়েছে। তার ওপর এখন নিজেদের জেনারেটর থেকে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আলোয় জায়গাটা দিনের মতো ফর্সা হয়ে রয়েছে। মনে হল, ইয়েতির কর্তাবাবার সাহস হবে না, আবার এখানে এসে ঢুঁ মারে। কর্নেল জায়গাটা দেখতে দেখতে একটু হেসে ঠিক তাই বলে উঠলেন।

খাওয়ার পর ক্যাম্পচেয়ারে বসে সবাই যখন গল্পগুজব শুরু করেছে, আমি তখন তাঁবুর ভেতরে গড়িয়ে পড়েছি। শরীর একেবারে অচল। ঘুম পাচ্ছে প্রচণ্ড। আতঙ্কও হচ্ছে—যদি ইয়েতে এসে আমারও গলা চেপে ধরে!

ঘুমিয়ে পড়ার আগে অব্দি বাইরে ওদের কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলুম। কর্নেল বলছিলেন—ইয়েতির চামড়া কেমন মনে হয়েছিল বললেন মিঃ সান্যাল? খসখসে—শক্ত, তাই না? দ্যাটস পসিবিল্।

হংসধ্বজবাবুর গলা শুনলুম।—হ্যাঁ, খসখসে, শক্ত! কেমন যেন প্লাস্টার আঁটা মানুষের মতো!...

তারপর ঘুমিয়ে গেছি। এমন গভীর ঘুম জীবনে ঘুমোই নি। ইয়েতি এলে দিব্যি আমাকে মেরে যেতে পারত। ঘুম যখন ভাঙল, অভ্যাসমতো হাতঘড়ির দিকে তাকালুম—ছ'টা। কিন্তু প্রচুর রোদ ফুটেছে বাইরে। অরুণাচল কি না। তখন নিজের ঘুমের প্রতি ব্যাজার হলুম। এমন ঘুম তো কলকাতায় দেখি না আসতে! এই ইয়েতির জঙ্গলে এত ঘুম!

পাশের ক্যাম্পখাটের দিকে তাকিয়ে দেখি বুড়ো নেই। উঠে পড়লুম। বাইরে যেতেই দেখা হল হংসধ্বজের সঙ্গে। বললেন—গুড মর্নিং মিঃ চৌধুরী!

—গুড মর্নিং! কর্নেল কোথায়?

—উনি তো পাঁচটায় বেরিয়েছেন। আমি অবশ্য তখনও

ঘুমোচ্ছিলুম। শুনলাম একা বেরিয়েছেন। ওরা নিষেধ করেছিল—শোনেন নি। এখন আগরওয়াল ওঁর খোঁজে গেল। ...উদ্বিগ্ন মুখে হংসধ্বজ একথা বললেন।

আমি হেসে বললুম—ভাববেন না। ওঁর নানান বাতিক। সঙ্গে অদ্ভুত ক্যামেরা দেখেছেন। বাইনাকুলারটাও আশা করি দেখেছেন। হয়তো দেখবেন, ইয়েতির ছবি তুলে নিয়েই ফিরে আসবেন।

হংসধ্বজ তবু আশ্বস্ত হতে পারলেন না। বললেন—এলাকার উপজাতীয় কোন কোন গোষ্ঠী এখনও খানিকটা বন্য স্বভাবের এবং হিংস্র। সভ্য মানুষ দেখলে মেরে ফেলে। তাছাড়া বৈরী নাগারাও থাকতে পারে! বেশিদূর গিয়ে পড়লে......

বাধা দিয়ে বললুম—কর্ণেল তো বলেছিলেন, এলাকা ওঁর চেনা। ভাববেন না। ওই বুড়োকে তো আমি চিনি।

চা-ব্রেকফাস্টের পর আমাকে হংসধ্বজ ওঁদের খনির কাজ দেখাতে নিয়ে গেলেন। সব ঘুরে দেখতে দশটা বেজে গেল। তারপর কর্ণেল ফিরলেন। সঙ্গে আগরওয়ালও আছেন। আগরওয়াল এসেই বললেন—সান্যাল! ইউরেকা! এইজন্যেই তো আমি তোমাকে বলেছিলুম—কর্ণেল সায়েব ছাড়া এই ইয়েতি রহস্য ফাঁস করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। ক্লু পাওয়া গেছে।

হংসধ্বজ অবাক হয়ে বললেন—তার মানে?

—কর্ণেল সেই ইয়েতির পায়ের ছাপ খুঁজে পেয়েছেন। আমিও গিয়ে স্বচক্ষে দেখলুম। একেবারে মানুষের মতো!

কর্ণেল একটু হেসে বললেন—না, কতকটা মানুষের মতো!

হংসধ্বজ উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করলেন—কোথায় দেখলেন? কত দূরে? কাছাকাছি নাকি?

—খুব বেশি দূরে নয়। ওই নদীর বালিতে—মাত্র তিনশো গজ দূরে।

হংসধ্বজের মুখ সাদা হয়ে গেল।—সর্বনাশ! বলেন কী!

আগরওয়ালকে দেখে মনে হল, ভয় পান নি। বললেন—শুধু তাই নয়। ওই পায়ের ছাপ অনুসরণ করে আমরা ওপারের পাহাড়ের একটা গুহার সামনে পৌঁছলুম। গুহায় অবশ্য ঢুকতে সাহস পাই নি। পরে লোকজন নিয়ে ঢুকব বলে দুজনে বড় একটা পাথর ঠেলাঠেলি করে মুখটা বন্ধ করে এলুম। সান্যাল অবিকল সেই রাতের মতো বিটকেল গন্ধও আমি টের পেয়েছি সেখানে।

কর্ণেল মাথা নেড়ে বললেন—আমি অবশ্য পাই নি।

আমি বললুম—ইয়েতির কাছে ওই পাথরটা কি বাধা হবে মনে করেন কর্ণেল ?

ও তো এক ধাক্কায় গুহার দরজা ফাঁক করে বেরিয়ে আসবে।

কর্ণেল মাথা নাড়লেন আবার। —ইউ আর রাইট, জয়ন্ত।

—তাহলে পাথর ঠেলাঠেলি করতে গেলেন কেন, শুনি ?

—আগরওয়াল সায়েব জেদ করলেন, তাই।

আগরওয়াল ব্যস্তভাবে বললেন—কর্ণেল! পাথরটা কিন্তু এমনভাবে খাঁজে আটকে দিয়েছি আমরা যে গুহার ভেতর থেকে ঠেলে সরানো অসম্ভব।

কর্ণেল তাঁর দিকে ঘুরে বললেন—ইউ আর রাইট।

আমি হতভম্ব। আমাকেও রাইট বললেন, আবার আগরওয়ালকেও রাইট বললেন? অর্থাৎ ইয়েতিটা গুহার মুখের পাথর ঠেলে বেরিয়ে আসতে পারবে এবং পারবে না—এমন পরস্পর-বিরোধী কথা কেন বললেন কর্ণেল? বুড়িয়ে বাহাত্তুরে ধরেছে নির্ঘাৎ। মনে মনে হাসলুম—আবার উদ্বিগ্নও হলুম।

হংসধ্বজ ভয়ে ভয়ে বললেন—আপনি কি মনে করেন, সত্যি গুহার মধ্যে ইয়েতি আছে।

কর্ণেল আবার মাথা নাড়লেন। —জানি না। তবে পায়ের ছাপ আমরা গুহার ভেতর অব্দি দেখেছি। এটুকুই বলতে পারি। যাইহোক, আপনারা লোক যোগাড় করুন। দুঘণ্টার মধ্যে আমরা বেরোব…

একটু পরেই দেখি, খবরটা কিভাবে পাচার হয়ে গেছে। ইতস্তত জটলা এবং আলোচনা চলছে। কুলিকামিন, সার্ভেয়ার গ্রুপ সবাই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। হংসধ্বজ এবং আগরওয়াল বেগতিক দেখে সবাইকে সাহস দিয়ে বেড়াচ্ছেন। সেই ফাঁকে কর্ণেল আমার হাত ধরে টানলেন। তারপর একটা গাছের তলায় গিয়ে চাপা এবং গম্ভীরস্বরে বললেন—জয়ন্ত! এক অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছি এখানে এসে। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না। কিন্তু এখানে এসে যা বুঝতে পারছি, তাতে…

বাধা দিয়ে বললুম—পুরো ব্যাপারটা গুল?

—স্রেফ গুলই বা বলি কী করে? আগের লোক যারা জনাকতক এখনও দলে রয়েছে, সকালে তাদের প্রত্যেকের কাছে ঘটনাটা জেনেছি। সবাই ইয়েতিকে দেখেছে। বিরাট সাদা মূর্তি। দুহাত সামনে ঝুলিয়ে হেঁটে গেছে। সে-রাতে ফুটফুটে জ্যোৎস্না ছিল। দেখতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। অথচ আমার ইনটুইশন বলছে—জয়ন্ত, আমার সেই বিস্ময়কর ইনটুইশনের কথা স্মরণ করো—যা থেকে আমি আবহাওয়ায় কোন হত্যাকাণ্ডের গন্ধ টের পাই।

ভয় পেয়ে বললুম—সে কী; আপনার মনে হচ্ছে এখানেও কোন হত্যাকাণ্ড হবে?

—হবে, জয়ন্ত। আই জাস্ট স্মেল ইট। কিন্তু কীভাবে হবে—কে খুন করবে, কেই বা খুন হবে—কিচ্ছু জানি না। কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। আমি নিজেকে এত অসহায় দেখছি—কহতব্য নয়।

উদ্বিগ্ন মুখে বললুম—হংসধ্বজ আর আগরওয়ালের মধ্যে পার্টনারশিপের ব্যাপারে কোন রেষারেষি নেই তো?

—কোন প্রমাণ পাই নি। কলকাতায় আগে ওঁদের কনসার্ন সম্পর্কে খোঁজখবর স্বাভাবিক কৌতূহলবশতই নিয়ে এসেছি। দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বললে ভুল হয়—একেবারে একাত্মা। একসঙ্গে খায় ও ঘুমোয়। দুজনেই বাবার জ্যেষ্ঠপুত্র—ঘরপালানো দুঃসাহসী ছেলে।

যা কিছু সম্পত্তি করেছে সব নিজেদের উদ্যমে। তাছাড়া, যা বুঝেছি—এইসব সম্পত্তি অর্জন, ওদের কাছে নেশার মতো। উদ্দেশ্যহীন। জীবনে এমন অনেক মানুষ আছে জয়ন্ত—যারা নেশার ঘোরে নানা কাজ করে বেড়ায়। টাকার মালিক হওয়াটাই তাদের সুখ নয়—সুখ বিচিত্র সব কাজে। এমন মানুষ এই দুই বন্ধু। এদের মধ্যে এমন কি ঘটতে পারে, আমি জানি না—যাতে কেউ কাকেও খুন করতে চাইবে?

—ধরুন, কোন রূপবতী স্ত্রীলোক এতদিনে দুই বন্ধুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কর্ণেল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তারিফ করার ভঙ্গীতে বললেন—ব্রিলিয়াণ্ট! জয়ন্ত, খাসা বলেছ। কিন্তু বলেছি তো আসার আগে ব্যাকগ্রাউণ্ড যা জেনেছি—তাতে তেমন করে কোন স্ত্রীলোকের সন্ধান পাই নি। ওঁদের চরিত্র সম্পর্কে এতটুকু দাগও ওঁদের ঘনিষ্ঠ বা চেনাজানা মহলে দেয় নি কেউ। পুলিশ রিপোর্টেও কিছু নেই

আমি চুপ করে থাকলুম। বুড়োর এ স্বভাবের কথা জানি। কেউ কোন ব্যাপারে ডাকলেই উনি তার সম্পর্কে বিশদ হালহদিস না জেনে এগোবেন না। ইয়েতিই হোক, আর বাড়িতে ভূতের ঢিল পড়ুক কিংবা চুরি ডাকাতিই হোক—মক্কেলের আত্তিপাত্তি জানা চা-ই।

কর্ণেল টুপি খুলে টাকে বাতাস লাগাচ্ছিলেন। হঠাৎ বললেন—এস জয়ন্ত, আমরা সার্ভেয়ার গ্রুপের হেড ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করি। উনি শুনেছি ভারতের শ্রেষ্ঠ ভূতত্ত্ববিদদের অন্যতম। অনেক চড়া দামে ওকে হংসধ্বজ বাবুরা ক'মাসের জন্যে এনেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার আজকাল এসব ব্যাপারে এক্সপার্টদের সহায়তা পাইয়ে দিচ্ছেন—তাই ওকে পেতে অসুবিধে হয় নি। তুমিও কোথাও খনিটনির সম্ভাবনা খুঁজে বের করো না! সরকার তোমাকে সবরকম টেকনিক্যাল নো-হাউ দিয়ে সাহায্য করবেন। করবে নাকি জয়ন্ত? খনি চলু

কথাটা বলে কর্ণেল হাসতে হাসতে পা বাড়ালেন। কিন্তু হাসিটা কেমন শুকনো মনে হল।...

দুপুর সাড়ে বারোটার মধ্যেই হংসধ্বজ আর আগরওয়াল প্রায় একশো লোকের একটা অভিযাত্রী বাহিনী গড়ে তুললেন। অধিকাংশই ওই অঞ্চলের অধিবাসী। তারা যেমন দুঃসাহসী, তেমনি গোঁয়ার মানুষ। অস্ত্রশস্ত্র প্রত্যেকের হাতেই রয়েছে। বন্দুকও মোট পাঁচটি। আমি ও কর্ণেল সঙ্গে এনেছিলুম শিকারের রাইফেল। হংসধ্বজ ও আগরওয়ালেরও শিকারের রাইফেল আছে। হেড সার্ভেয়ার মিঃ পরেশ পুরকায়স্থেরও নিজস্ব রাইফেল রয়েছে। তাছাড়া আমাদের প্রত্যেকের একটা করে রিভলবারও আছে। কাজেই আয়োজন খুব সাংঘাতিক হল। দেখলুম স্থানীয় লোকেরা ঢাকও নিয়েছে কয়েকটা। শিঙাও আছে গোটা দুই।

এছাড়া কয়েক টিন পেট্রোল আর ফার্স্টএডের সরঞ্জামও নেওয়া হল। সার্ভেয়ার গ্রুপের সঙ্গে একজন ডাক্তারও ছিলেন এখানে। ব্রজবিলাস বর্মণ আমাদের লোক। তিনি বড় ভীত মনে হল। মুখ পাংশু। ভিড়ের ভিতর ঢুকে অনিচ্ছায় পা বাড়ালেন।

রীতিমতো ইয়েতি অভিযান। সব খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে হাঁটছিলাম। জব্বর রকমের রিপোর্টাজ লিখতে হবে কাগজের জন্যে।

একঘণ্টা কষ্টকর যাত্রার পর প্রায় দুর্গম এক পাহাড়ের গুহার সামনে আমরা পৌঁছলুম। কর্ণেলকে দেখলুম, যেন মোটেও নেতৃত্ব নিতে রাজী নন। সব আগরওয়ালের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। অনেক জল্পনার পর ব্যূহ সাজানো হল কয়েকটা। গুহামুখ থেকে তিরিশ গজ দূরে একটা ঝোপের আড়ালে হংসধ্বজের নেতৃত্বে একদল ওৎ পেতে বসলো। দুটো দল যথাক্রমে হেড সার্ভেয়ার পরেশবাবু ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডাক্তারের নেতৃত্বে ডাইনে ও বাঁয়ে পাথরের আড়ালে বসলো। ঘুমোয়। দল গুহামুখের উপরে পাহাড়ে গেল। সেখানে গাছ ও পাথরের

আড়ালে তারাও বসলো। তাদের নেতাকে আমি চিনি না—মনে হল সার্ভেয়াদের কেউ। পঞ্চম দলে আমি ও কর্নেল—সঙ্গে কুড়িজন উপজাতীয় কুলিকামিন। আমরা চলে গেলুম পাহাড়ের পিছনের দিকে—একটা ফাটলে গিয়ে ঠাসাঠাসি বসে পড়লুম। ফাটলটা ভূমিকম্পের ফলে হয়েছে। আন্দাজ হাত ছয়েক চওড়া। অনেক ছোট বড় পাথরে ভর্তি। ইয়েতি তাড়া করলে নির্ঘাত মারা পড়তে হবে। এখানে বসার কারণ, গুহার অন্যমুখে ইয়েতি বেরোলে আমরা তাকে আক্রমণ করব। কিন্তু তাকে প্রাণে মারা চলবে না। ঠ্যাং খোঁড়া করে কাবু করতে হবে, অর্থাৎ জ্যান্ত ধরারই প্ল্যান করা হয়েছে।

কথা হয়েছে, গুহার মুখে শুকনো লকড়ি ঠেসে দিয়ে পেট্রোল ছড়িয়ে আগুন ধরানো হবে। ধোঁয়া দেখলেই আমরা প্রত্যেকটি দল সতর্ক হবো।

হঠাৎ দেখি কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দলের একজনকে ডেকে হিন্দীতে বললেন—নাতানুক! তুমি এদের লিডার হও। আমি আর এই জয়ন্তবাবু নীচের দিকে গিয়ে বসি। না না—আমরা দুজনই যথেষ্ট। মনে রেখো, তুমিই লিডার নাতানুক!

নাতানুক নামে লোকটা প্রৌঢ়। দারুণ শক্ত সমর্থ চেহারা—বেঁটে খাটো, থ্যাবড়া নাক, কুতকুতে চোখে হাসি। বুঝলুম ও খুশি হয়েছে। কুলিদের সর্দার সে। সায় দিয়ে একটা ধারালো প্রকাণ্ড দায়ের মুঠো যেভাবে চেপে ধরল, মনে হল ইয়েতির একটা ঠ্যাং সে কাটবেই। আমরা পিছনের দিকে দ্রুত এগোলুম। অবশ্য আমি কর্নেলের মতলব একটুও টের পাচ্ছি না। পাথরের বাধা পেরিয়ে অনেক কষ্টে ওঁকে অনুসরণ করছি। মনে প্রচণ্ড উত্তেজনা। তাহলে সেই কিংবদন্তীখ্যাত রহস্যময় তুষারদানব সত্যি কি স্বচক্ষে দেখার অমূল্য অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চলেছি? আমার সঙ্গে ক্যামেরাও আছে। ফিল্ম রেডি। শুধু শাটার টেপার ওয়াস্তা। এই ...ইন দৈনিক সত্যসেবকের পাতায় সত্যিকার ইয়েতির ছবি দে... এখন চলুন

হে ঈশ্বর, সদয় হও !

কিন্তু কর্ণেল থামবার তালে নেই। কোথায় যাচ্ছেন উনি ? ফাটলের শেষে একটা খোলা জায়গায় পড়লুম। অমনি পাহাড়ের অন্যদিক থেকে ভেসে এল তুমুল চিৎকার ও বন্দুকের শব্দ। তারপর ধোঁয়া দেখতে পেলুম। কর্ণেল বলে উঠলেন—জয়ন্ত ! কুইক, ওই পাথরের আড়ালে চলো।

প্রকাণ্ড পাথরের পিছনে গিয়ে বসলুম দুজনে। চেঁচামেচির সঙ্গে ঢাকের আওয়াজ ও বন্দুকের শব্দ বাড়তে থাকল। রুদ্ধশ্বাসে মুহূর্ত গুনছি। জানিনা ইয়েতিটা কোনদিকে বেরোবে। পাহাড়ের উপর আকাশে মেঘের মতো ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি।

তারপর আমার পাঁজরে খোঁচা দিলেন কর্ণেল। তাকিয়েই আমি হতবাক, চোখ নিষ্পলক। ক্যামেরার কথা ভুলেই গেলুম। দিন দুপুরের ঝলমলে রোদে এদিকটা ভরে আছে। পাহাড়ের এপিঠ সম্পূর্ণ ন্যাড়া। উপরের একটা খাঁজের তলায় দাঁড়িয়ে আছে···

হাঁ, সেই কিংবদন্তীখ্যাত প্রাগৈতিহাসিক তুষার মানব অথবা দানব। সেই রহস্যময় ইয়েতি ! বিশাল উঁচু ও চওড়া দেহ। উলঙ্গ। সম্পূর্ণ সাদা। চামড়া যেন ভাঁজবহুল। হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম। স্বপ্ন দেখছি না তো ? আমাদের মাথার উপর পাথরের চাতালে আন্দাজ কুড়িফুট দূরত্বে প্রাণীটা দাঁড়িয়ে এদিকওদিক তাকিয়ে দেখছে। লাফ দিলেই আমাদের উপর এসে পড়বে।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। তারপর কর্ণেল আচমকা হাততালি দিলেন। আর অমনি ইয়েতিটা আমাদের দেখতে পেল। তারপর চাতালের অন্যদিকে সরে গেল। আমি রাইফেল তুললেই কর্ণেল বললেন—ক্যামেরা জয়ন্ত, ক্যামেরা !

তখন রাইফেল নামিয়ে ক্যামেরা তুলে পটাপট কয়েকটা ছবি ঘনিষ্ঠ নয়। ততক্ষণে ইয়েতি লাফ দিয়েছে। চাতাল আছে ধাপে ঘুমোয়। দ কয়েকটি লাফে আমাদের পাথরটার আড়ালে যেতেই

কর্ণেল উঠে দাঁড়ালেন। আমিও উঠলুম। দেখলুম, ইয়েতিটা সমতলে পড়ে দৌড়চ্ছে। একেবারে মানুষের মতো দৌড়চ্ছে। কর্ণেল দৌড়তে শুরু করলেন তার পিছনে। আমি একটু ইতস্তত করে তাঁকে অনুসরণ করলুম। চেঁচিয়ে উঠলুম—সাবধান কর্ণেল।

গাছপালার মধ্যে তখন ঢুকে পড়েছে জন্তুটা। কর্ণেল কি পাগল? তিনি পিছনে দৌড়চ্ছেন—আমিও বোকার মতো দৌড়চ্ছি। হাঁফাতে হাঁফাতে বললুম, গুলি করুন। কর্ণেল, গুলি!

কর্ণেল আমাকে বোকা বানিয়ে জোরে হেসে উঠলেন এবং চাপা গলায় ইয়েতিটার উদ্দেশে বললেন—আমরা আপনার বন্ধু মিঃ সান্যাল! প্লীজ, একটু দাঁড়ান। আপনার কোন ভয় নেই।

আমাদের চারপাশে ঘন জঙ্গল। ছায়া আছে। ইয়েতিটা তক্ষুণি দাঁড়িয়ে গেল। ঘুরে মানুষের কণ্ঠস্বরে বলে উঠল—কে আপনারা?

কর্ণেল অকুতোভয়ে এগিয়ে গিয়ে বললেন—আমি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার। ইনি কলকাতার দৈনিক সত্যসেবকের প্রখ্যাত রিপোর্টার জয়ন্ত চৌধুরী। আর জয়ন্ত, ইনিই হলেন আদি ও অকৃত্রিম মিঃ হংসধ্বজ সান্যাল।

আমি আকাশ থেকে পড়লুম। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলুম। কর্ণেল বললেন—আপাতত মিঃ সান্যাল, আপনার গায়ের প্লাস্টারগুলো আগে ছাড়িয়ে ফেলা দরকার। আপনার আর ইয়েতি সাজবার কোন কারণ নেই। আমি সব টের পেয়েছি।

ইয়েতি ক্লান্তস্বরে বললেন—কিন্তু আগরওয়াল আর ওই শয়তান প্রতারকটার কী হবে? ওদের যে আমি শাস্তি দিতে পারলুম না! মাকেই ওরা পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্র করল।

ল হাত তুলে তাকে আশ্বস্ত করে বললেন—সেজন্যে আইন ঃ সান্যাল। এসব ব্যাপারে আপনি আমার ওপর নির্ভর করতে কিন্তু প্রতিশোধ নিতে আপনি যে অভিনব পন্থা নিয়েছেন, কাজের নয়: উল্টে আপনিই পুড়ে মরতেন। এখন চলুন,

কোন ঝর্ণা দরকার। সেখানে গায়ের প্লাস্টার খুলে আমরা তিনজনে কোন উপজাতীয়দের গ্রামে যাব। সেখানে আপনাকে নিরাপদে রেখে আমরা দুজনে ফিরব। কথা দিচ্ছি, আগামীকাল যে কোন সময় আমরা এসে আপনাকে নিয়ে যাব। ততক্ষণে আপনার পার্টনার আগরওয়াল এবং তার সহকারী জাল হংসধ্বজ সান্যালকে গ্রেফতার করা হয়েছে, জানবেন।...

তখন বিকেল হয়েছে।

দাফাং নামে একটা গ্রামের মোড়লের বাড়ি সত্যিকার হংসধ্বজ বাবুকে রেখে আমরা ফিরলুম ক্যাম্পে। দেখি, সবাই কখন ফিরেছে। আমাদের দেখে আগরওয়াল ও জাল হংসধ্বজ দৌড়ে এলেন। কর্ণেল ক্লান্ত স্বরে বললেন—ইয়েতিটার পিছনে অনেকদূর গিয়েছিলুম। গুলিও করলুম। কিন্তু আমাদের বরাত। পালিয়ে গেল।

কথামতো আমি ইনিয়ে বিনিয়ে সব ব্যাপারটা বানিয়ে শোনালুম। শুনে ওরা খুব নিরাশ হলেন। তারপর কর্ণেলের পরামর্শমতো আমি কলকাতায় আমার কাগজে খবর পাঠাতে তক্ষুণি সদিয়া যেতে চাইলুম। জীপের ব্যবস্থা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। অনেক রাতে সেখানে সরকারী বাংলোর চৌকিদারকে ঘুম থেকে তুলিয়ে নিজের পরিচয় দিলুম। জিপের ড্রাইভারকে বললুম—আপাতত এখানেই রাত কাটাতে চাই। কাল সকালে আমরা ফিরব। সে রাজী হল। রাস্তা দুর্গম—তাতে বৈরী নাগাদের ভয় আছে। রাতে ফেরা নিরাপদ নয়।

সেই রাতেই কর্ণেলের চিঠি নিয়ে থানায় যোগাযোগ করলুম। তারপর রাতটা বাংলোয় কাটিয়ে পরদিন সকালে ক্যাম্পে পৌছলুম। পুলিশ আসবে কথামতো দুপুরের মধ্যেই।

কিন্তু তখনও রহস্যের চাবিকাঠি কর্ণেলের হাতে। এই ওর অভ্যাস।

কর্ণেল কিছুক্ষণের জন্যে একবার একা জঙ্গলে ঘুরে এলেন। বিরল জাতের পাখি দেখতেই বেরিয়েছিলেন। আমি আগরওয়ালদের

নানা কথায় ভুলিয়ে রাখলুম। তারপরে সবে লাঞ্চ সেরে কর্ণেল ও আমি তাঁবুতে গড়াচ্ছি—পুলিশের জিপের আওয়াজ কখন শোনা যাবে সেই প্রতীক্ষা করছি—হঠাৎ আগরওয়ালের তাঁবু থেকে চাপা ধ্বস্তাধস্তির শব্দ কানে এল। কর্ণেল অমনি লাফিয়ে উঠে বললেন—কুইক জয়ন্ত! রিভলবার রেডি করে নাও। চলে এস। দেখলুম উনিও রিভলবার হাতে নিলেন। দুজনে দৌড়ে আগরওয়ালের তাঁবুতে গেলুম। কর্ণেল পর্দা তুলেই গর্জে উঠলেন—মিঃ আগরওয়াল, দাঁড়ান!

উঁকি মেরে এক পলকেই দেখলুম দৃশ্যটা। দুটো ক্যাম্প খাটের মাঝে মেঝেয় জাল হংসধ্বজকে ফেলে তার বুকে বসে আছেন আগরওয়াল। দুহাতে গলা টিপে ধরেছেন লোকটার।

আগরওয়াল তখনি উঠে কাঠ হয়ে দাঁড়ালেন। কর্ণেল বললেন—কাজে নেমে ঝগড়া মারামারি কাজের কথা নয় মিঃ আগরওয়াল। বখরা নিয়ে এসব ক্ষেত্রে খুনোখুনি হয়েই থাকে। তবে খুন করে ইয়েতির ঘাড়ে চাপানোর আর উপায় নেই মশাই।

আগরওয়াল ঘোঁত ঘোঁত করে বললেন—কী বলছেন, বুঝতে পারছি না।

—নিশ্চয় পারছেন। বিশেষ করে যখন সত্যি সত্যি ইয়েতির আবির্ভাব ঘটেছে। তখন সবই টের পেয়ে গেছেন বই কি। নিশ্চয় আঁচ করেছেন, এই ইয়েতিটা আসলে কে!...কর্ণেল একটু হাসলেন। —অবশ্য, আপনি যখন আমার কাছে ইয়েতির খবর নিয়ে যান, তখন একটুও ভাবেন নি যে এই ইয়েতিটা আপনার পার্টনার ও আজীবন বন্ধু হতভাগ্য হংসধ্বজ সান্যাল। তখন সত্যিকার ইয়েতির আতঙ্কেই আমার সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু এবার যখন কথায় কথায় আমি এই জাল হংসধ্বজের কাছে জেনে নিলুম যে ইয়েতির গায়ের চামড়া খসখসে শক্ত এবং ভাঁজবহুল—কতকটা প্লাস্টারের মতো, তখনই আপনি সন্দেহ করতে শুরু করেন। তারপর ওই গুহার দরজায় গত

কাল সকালে আমার সঙ্গে গিয়ে ঠিক আমরাই মতো এমন কিছু চিহ্ন আপার চোখে পড়েছিল, যাতে ইয়েতিটা যে কে চিনতে আপনার দেরী হয় নি। তাই তাকে পুড়িয়ে মারতে ব্যবস্থা করলেন। সবই ঠিক ছিল। বাদ সাধলুম আমি। গুহার পেছন দিকটায় আমি থাকতে চাইলুম। তাতে আপত্তির কারণ ছিল না। কারণ ইয়েতি বেরোলে নাতান্নুক সর্দাররা ঝোঁকের বশে তাকে মেরেই ফেলত। আপনি কৌশলে ইয়েতির লাশটা নিশ্চয় আমার অগোচরে নষ্ট করার ব্যবস্থা করতেন। কিংবা একটা গল্প রটাতেন। যাই হোক, এবার আপনি দ্বিতীয় খুনের উদ্যোগে ব্যস্ত ছিলেন। কারণ, এই জাল হংসধ্বজ সব টের পেয়ে আপনাকে ব্ল্যাকমেল শুরু করেছিলেন। গত রাতে সুবিধে হয় নি—কারণ জয়ন্ত ছিল না বলে আমি জাল হংসধ্বজকে শুতে ডাকলুম। তাই মরিয়া হয়ে আজ কাজে নেমেছিলেন।

জাল হংসধ্বজ উঠে বসেছিল। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—সবে ঘুম এসেছে। হঠাৎ দেখি ব্যাটা আমার বুকে চেপে গলা টিপে ধরেছে। উঃ! আগে যদি জানতুম ওর মতলবটা কি!

কর্ণেল বললেন—হাঁ। ওর তর সইছিল না। স্পষ্ট বোঝা যায়, এরপর আগরওয়াল চাদর মুড়ি দিয়ে লাশ ঢেকে রাখতেন। আমাদের বলতেন—সান্যাল অসুস্থ, বিশ্রাম নিচ্ছেন। তারপর রাতে হইচই করে রটাতেন যে ইয়েতিটা এসেছিল! সেই গলা টিপে মেরে গেছে। বাঃ! চমৎকার সুযোগ! কারণ, গুহায় তখন ইয়েতিটা মারা পড়ে নি। অতএব কি না প্রতিশোধ নিয়ে গেছে। অপূর্ব, মিঃ আগরওয়াল!

পুলিশের জিপের আওয়াজ শোনা গেল এতক্ষণে!···

আমরা সদিয়ার ডাকবাংলোয় রাত কাটাচ্ছিলুম। কলকাতা ফিরে আসছি। 'অরুণাচলের ইয়েতি' নিয়ে ভাবছি, কর্ণেল বললেন—বৎস জয়ন্ত কি হতাশায় ভুগছ?

—অবশ্যই! ইয়েতি যে গুল, সাতকাহন লেখার মানে হয় না।

—কিন্তু তার বদলে 'সীমান্তে গুপ্তচর চক্র উচ্ছেদের' কী চমৎকার একটা খবর তোমরা এবার ছাপবার সুযোগ পেলে দেখ!

অবাক হয়ে বললুম—গুপ্তচর চক্র! তার মানে? কোথায় গুপ্তচর?

কর্ণেল দাড়ি চুলকে বললেন—ও, আই অ্যাম সরি। তোমাকে মূল ব্যাপারটা তো বলাই হয় নি।

—কিছু বলা হয় নি। কেনই বা জাল হংসধ্বজ—কেন এসব ঘটলো…

—এক মিনিট। বলছি সব। বলে কর্ণেল চুরুট ধরালেন। আরামে হাত পা ছড়িয়ে বসলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন: হংসধ্বজ সান্যাল লোকটি সৎ—কিন্তু নির্বোধ। তাছাড়া তাঁর মাথায় কিঞ্চিৎ পাগলামিও আছে। নানান অদ্ভুত কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধাও করেন না। দুর্গম এলাকায় খনি খোঁজা তাঁর বাতিক। নেফা এলাকায় তিনি সেই উদ্দেশ্যেই যাতায়াত করতেন। আর তাঁর বন্ধু হরিহর আগরওয়াল তাঁর উল্টো—অসম্ভব ধূর্ত। যেভাবে হোক, এই এলাকায় এসে আগরওয়াল হংসধ্বজের অগোচরে এক বিদেশী রাষ্ট্র ও বৈরী নাগাদের যোগাযোগের মূল মাধ্যম হয়ে ওঠে। হংসধ্বজ আগে জানলে তাঁকে বাধা দিতেন। জানলেন সীসের খনি খুঁজতে এসে যখন ক্যাম্প করা হল, তখন। বিস্ময়ে দুঃখে হতচকিত হলেন হংসধ্বজ। বোঝাবার চেষ্টা করলেন বন্ধুকে। কিন্তু তখন আর আগরওয়ালেরও ফেরার পথ নেই। বৈরী নাগাদের যে গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ, তখন উল্টো গাইলে তারা তাকে মেরে ফেলবে—আবার হংসধ্বজকেও খুন করবে।

এদিকে হংসধ্বজ তাঁকে শাসাচ্ছেন—নাগাদের সঙ্গে আর এতটুকু যোগাযোগ রাখলে পুলিশকে জানাতে বাধ্য হবেন। অবশ্য সেটা নিছক হুমকি। এই সীসের খনি আর বন্ধুত্ব দুই-ই হংসধ্বজের কাছে মূল্যবান। আগরওয়াল দেখলেন, যেদিকে পা বাড়াবেন, সেদিকেই বিপদ। যদি

চিরদিনের নির্বোধ ও ছিটগ্রস্ত এই বন্ধুটি সত্যি সত্যি ঝোঁকের বশে টহলদার পুলিশ বা সেনাবাহিনীর কানে কথাটা তুলে দেন, সাংঘাতিক কাণ্ড হবে। শেষ অবধি আগরওয়ালের মাথায় খুন চড়ে গেল। ক্যাম্পে তখনও সার্ভেয়াররা পৌঁছায় নি। কেবল একদল কুলি যোগাড় করা হয়েছে। তারা স্থানীয় লোক। এসে হাজিরা দিয়েই নিজেদের গাঁয়ে ফিরে যায়। একরাতে আগরওয়াল ঘুমন্ত বন্ধুর বুকে বসে গলা টিপে ধরলেন। যখন দেহটা নেতিয়ে পড়ল, চুপিচুপি সেটা নিয়ে গিয়ে পাহাড় গড়িয়ে ফেলে দিলেন। রান্না ও অন্যান্য কাজের লোক জনা পাঁচ ছিল। তারা কেউ টের পেল না। সকালে রটিয়ে দিলেন, হংসধ্বজ বাতে মদিরা গেছেন। ফিরতে দু' একদিন দেরী হবে।

ওদিকে একটা পাহাড়ের খাদে যেখানে দেহটা ফেলেছেন, তার নীচেই নদী। নদীতে গভীর বালি আছে। আশ্চর্য শক্ত প্রাণ হংসধ্বজের! পরদিন একদল উপজাতীয় শিকারী তাঁকে মুমূর্ষ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিয়ে যায় নিজেদের গাঁয়ে। সেবাশুশ্রূষা করে। তারপর সাত মাইল দূরে বাংলা মিশনারী হাসপাতালে রেখে আসে। এ ঘটনা ২০শে মে ঘটেছিল। ২৩শে মে ক্যাম্পে সার্ভেয়াররা আসে। কাজ শুরু হয়। কিন্তু রাঁধুনি চাকরবাকর সবাইকে রাতারাতি তখন সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা এই ভুতুড়ে বন-বাদাড় থেকে পালাতে পারলে বেঁচে যায়। সব ছিল সমতলের বাসিন্দা। নতুন রাঁধুনি ও চাকরবাকর এনেছে আগরওয়াল। আর এনেছে ওই জাল হংসধ্বজকে। হংসধ্বজের উদ্যোগে এবং তার পার্টনারশিপেই খনির লাইসেন্স, সরকারী লোন ও টেকনিক্যাল সহায়তার ব্যবস্থা। অতএব হংসধ্বজ একজন থাকা চাই পাশে। পরে যখন দরকার বুঝত, তখন সে জালটাকেও খতম করে দিত এবং ইয়েতির নামেই সেটা রটাত। এই জঙ্গলে মানুষ খুন করা এমন কিছু কঠিন নয়। যাইহোক, জাল হংসধ্বজকে নিয়ে নির্বিঘ্নে কাজ চলছিল। ২৫শে মে রাতে হঠাৎ ক্যাম্পে ইয়েতির আবির্ভাব ঘটল। ভয় পেয়ে গেল আগরওয়াল।

ইয়েতিটা সেও স্বচক্ষে দেখল। একেবারে সত্যিকার আতঙ্ক। সার্ভেয়াররা পালিয়েছে। কুলিরা ভেগে গেছে। তাই সে কলকাতায় গিয়ে আমার শরণাপন্ন হল। কোন এক সূত্রে আমার সঙ্গে তার অল্পস্বল্প চেনা ছিল। আমি ইয়েতিটা ধরতে বা হত্যা করতে পারলে তার সীসের খনি এবং গুপ্তচরচক্র দুটোই বজায় থাকে।

এবার প্রশ্ন করলুম—ইয়েতির প্ল্যান হংসধ্বজবাবুর মাথায় এল কীভাবে?

কর্নেল হেসে উঠলেন। বললেন—মে মাসের মাঝামাঝি এই এলাকায় একজোড়া দশফুট উঁচু মানুষের মতো প্রাণী ধরা পড়ে উপজাতীয়দের হাতে। সে খবর তোমরাও বক্স করে ছেপেছিলে। আসলে আমার ধারণা, ও দুটো একজাতের ভালুক।

বললুম—হংসধ্বজ বাবুর মাথায় তাহলে ওই থেকেই ইয়েতি সেজে প্রতিশোধের বাসনা গজায়?

কর্নেল আরও জোরে হাসলেন। ভদ্রলোক রীতিমত পাগল। অনায়াসে কোন সেনাবাহিনীর কাছে বা টহলদার পুলিশকে জানাতে পারতেন। তা না করে শত মাইল দূরের বাংলা মিশনারী হাসপাতাল থেকে সারা গায়ে প্লাস্টার জড়ান অবস্থায় রাতারাতি উধাও হন। জঙ্গলে এসে সাদা কাপড়ে বাকি অংশও জড়ান। ওই বিকটমূর্তিতে হানা দেন ২৫ মে রাতে। ভাগ্যিস, গুলি ফসকেছিল ওদের। অথচ কাণ্ড দেখ, তবু দমে যান নি ভদ্রলোক। পাগল আর বলে কাকে? অবিবাহিত লোকেরা যত বয়স বাড়ে, তত অদ্ভুত হয়ে ওঠে। তুমি ভাগ্যিস বিয়েটা সেরে নিয়েছ জয়ন্ত।

হেসে বললুম—ওই পাহাড়ের গুহায় থাকতেন হংসধ্বজ। কিন্তু খেতেন কী?

—হ্যাঁ। গুহাটা থাকার উপযোগী। আর খেতেন চুরি করে।

—চুরি করে? সে কী?

—হ্যাঁ। রাতে উপজাতিদের গ্রামে হানা দিতেন চুপি চুপি। ওই

বিকটমূর্তি দেখে অমন হিংস্র লোকেরাও গর্তে সেঁধিয়ে যেত কিনা। কুকুরগুলোও ভয়ে কাঠ হয়ে যেত। গোটা এলাকা জুড়ে এখন ইয়েতির খবর শুনতে পাবে। ভাগ্যিস সভ্য জগতের বাইরে পাহাড় জঙ্গল এলাকা। নয়তো ধুন্ধুমার পড়ে যেত। হ্যাঁ—জয়ন্ত শোন। এলাকায় ইয়েতিকে বলে 'বুরু'। মনে রেখো: বুরু। এই উপজাতীয়রা এত সাহসী ও হিংস্র মানুষ, অথচ তারা বুরুর নাম শুনলে কেঁচো হয়ে যায়।

একটু চুপ করে থেকে বললুম—গৌহাটিতে আমাদের জাল হংসধ্বজই রিসিভ করেছিলেন। এতটুকু টের পাইনি কিন্তু।

কর্ণেল বললেন—না। আমার কেমন একটু লেগেছিল। গেটে নেমপ্লেটটা যেন সদ্য বসানো হয়েছে। টাটকা চকচকে পালিশ। তাছাড়া বাড়ির চাকরগুলোও মনে হল নতুন এসেছে। মনে একটা খটকা লেগেছিল বৈকি। তখন থেকেই আমার তদন্ত শুরু।

—ওর আসল নাম কী?

—চন্দ্রনাথ সিং। পাঞ্জাবী।

লাফিয়ে উঠলুম—বলেন কী! এতটুকু ধরতে পারি নি কথাবার্তায়।

কর্ণেল মিটিমিটি হেসে বললেন—আমি পেরেছিলুম। তবে যা জাল তা সহজেই যদি জাল বলে লোকে ধরতে পারে, তাহলে জাল হতে যাবে কোন দুঃখে? এটি খাঁটি জাল। তাই ধরা কঠিন ছিল।

একটু পরে আমি বললুম—আমার রিপোর্টাজের নাম তাহলে হওয়া উচিত ছিল 'অরুণাচলের বুরু।' কর্ণেল কোন জবাব দিলেন না। চোখ বুজে কী ভাবছেন কে জানে।...

এ সমুদ্রে অ্যালবাট্রস পাখি নেই। তবু একটা রেস্তোরাঁ-কাম-বারের নাম অ্যালবাট্রস। ভারতের পূর্ব-উপকূলে এমন চমৎকার মিষ্টি-স্বভাবের টাউনশিপই বা কটা আছে? সমুদ্রও এখানে বেশ শান্ত। মার্চের দক্ষিণবায়ু দুপুরের দিকে দাপাদাপি করলেও বিকেলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ঢেউগুলো খুব আড়ষ্ট হয়ে বালির বীচে শুয়ে পড়তে চাইছে। আমার জুতোর তলা একটুখানি ভিজে যাচ্ছিল। এটাই আমাকে সমুদ্রস্নানের আনন্দ দিল। আমার বুড়ো সঙ্গী বলেন, অনেকের অনেক রকম আতঙ্ক থাকে। যেমন বেড়ালের জলাতঙ্ক। জানি, উনি আমাকেই ঠাট্টা করেন! কিন্তু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, সমুদ্র যতই শান্ত হোক, সমুদ্র হচ্ছে সমুদ্রই। তার জল লোনা, বিশ্রী রকমের স্বাদ তার। আত্মহত্যার দরকার না হলে কখনও আমি সমুদ্রে নামব না।

যতক্ষণ বীচে জলের ধার ছুঁয়ে ছুঁয়ে হেঁটে বেড়ালুম, আড়চোখে লক্ষ্য করে গেলুম বুড়ো টুপি খুলে অ্যালবাট্রসের লনে বসে আছেন। তাঁর টাকের ওপর নারকেলগাছের ছায়ার ফাঁক দিয়ে রোদের চিরুণী চলছে—অবশ্য বৃথাই। উনি খুবই আলাপী, সদালাপী এবং গায়ে-পড়া—তা সত্ত্বেও এখনও কোন আগন্তুক ওঁর পাশে বসে নেই। এতদিন বাদে ওঁকে দারুণ একলা দেখাচ্ছিল। আমার মায়া জাগছিল।

পিছনে পাহাড়ের আড়ালে সূর্য নেমে গেলে সমুদ্রে এতক্ষণে রঙের খেলা শুরু হল। এই দৃশ্যের বর্ণনা ভাষায় দেওয়া যায় না, ছবি এঁকে খানিকটা যা অনুসরণ করা যায়। আমি না লেখক, না ছবি আঁকিয়ে

—নিতান্ত সাংবাদিক। এই ব্যাপারটার রিপোর্টাজ লিখতে হলে আমার চাকরি রাখা কঠিনই হতো। আমি রিপোর্টার। আমার চিফ বলেন, জয়ন্তের মেটিরিয়াল থাকে—কলম থাকে না এবং এটাই হচ্ছে ট্রাজেডি।

মিনিট পাঁচেক ওই রঙের খেলা দেখে চোখ ব্যথা করতে থাকল। তখন ঘুরে দাঁড়ালুম এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য উপকূলনগরীকে রহস্যময় অন্ধকারে ডুবে থাকতে দেখলুম। চোখ পিটপিট করে সেই অন্ধকারকে তাড়াতে চাইছি, এমন সময় পাশ থেকে কে বলে উঠল—কিছু মনে করবেন না. আপনি কি বাঙালী ?

বাঙালী ব্যারাম আমারও একটু-আধটু আছে। তবে সেজন্য নয়, যার প্রশ্ন সে স্ত্রীলোক, এটাই আমাকে অসাধারণ ভব্য করে তুলল। রঙচমকানো চোখের অস্বচ্ছতায় একটা শাড়িপরা মূর্তি ভেসে উঠল। বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি······

—নমস্কার। আমি······আমি কলকাতা থেকে এসেছি। আমি একটু বিপদে পড়েছি—একটু সাহায্য পেতে পারি কি ?

চোখের স্বচ্ছতা তখনও ফেরে নি। তাই মুহূর্তে মাথায় এল, নির্ঘাৎ কিছু ভিক্ষেটিক্ষে চাইবাব ব্যাপার ঘটছে। তক্ষুণি গম্ভীর হয়ে বললুম—বিপদ! কী বিপদ ?

—আমার স্বামীকে দুপুর থেকে খুঁজে পাচ্ছি না।

হাসি চেপে বললুম—খুঁজে পাচ্ছেন না ? আপনার স্বামীকে ? তার মানে ? ·····

—হ্যাঁ। আমরা এখানে এসেছি গতকাল সন্ধ্যায়। তারপরেই এমন কতকগুলো ব্যাপার ঘটল, খুব ভয় পেয়ে গেলুম। উনি অবশ্য গ্রাহ্য করলেন না। আজ দুপুরে খাওয়ার পর উনি আসছি বলে বেরিয়ে গেলেন। তখন প্রায় একটা বাজে। এখন পাঁচটা। দেরি দেখে সম্ভবপর সব জায়গায় খুঁজলুম, কিন্তু কোন খোঁজ পেলুম না। আমার বড় ভয় হচ্ছে ·····

বলেই ভদ্রমহিলা যেন কান্নার আবেগ সামলাতে থেমে গেলেন। ততক্ষণে আমার চোখ থেকে রঙের ভেলকি ফুরিয়ে গেছে। দৃষ্টি স্পষ্ট হয়েছে। দেখলুম, মহিলার বয়স তেইশ-চব্বিশের বেশি হতেই পারে না, মোটামুটি ফর্সা রঙ, হাল্কা গড়ন কিন্তু চেহারা মন্দ না, চোখ দুটো টানাটানা এবং দুটো শক্তিশালী ভুরুর প্রশ্রয়ে একটু প্রগলভও বটে। বড়লোকের বউ বলে মনে হল না। আবার গরীব বা নিম্নমধ্যবিত্তও নয়। ব্যক্তিত্ব আছে এবং তাই তাঁর বিবরণে কোন ফাঁকি থাকতে পারে না।

রহস্যের গন্ধে চঞ্চল হয়ে উঠলুম। আড়চোখে দূরে অ্যাল্‌বাট্রসের লনে বুড়ো ঘুঘুটিকে দেখে নিলুম। বুড়ো যেন চোখ বুজে ঝিমুচ্ছে।..

বললুম—খুব অদ্ভুত ব্যাপার তো! কিন্তু আপনার স্বামী তো মাত্র চার ঘণ্টা আগে বেরিয়েছেন—কোথাও নিশ্চয় কোন জরুরী কাজে আটকে পড়েছেন। এতে ভাববার কারণ আছে বলে তো মনে হয় না। আরও কিছুক্ষণ দেখুন না—নিশ্চয় ফিরে আসবেন। আর... ইয়ে, আপনার স্বামীর নামটা জানতে পারি?

—পুলকেশ মৈত্র। আমি তৃণা মৈত্র।

—আমি জয়ন্ত চৌধুরী।...একটু ইতস্তত করে কেন কে জানে বলে ফেললুম—আপনি প্রখ্যাত দৈনিক সত্যসেবকের নাম নিশ্চয় জানেন। আমি ওই কাগজের রিপোর্টার।

শুনে তৃণা মৈত্র উজ্জ্বল মুখে বলল—আপনি রিপোর্টার জয়ন্তবাবু, প্লীজ, এ বিপদে আমাকে সাহায্য করুন একটু। এখানে এসে একজনও বাঙালী দেখতে পেলুম না। তাই বিশ্বাস করে কাউকেও কথাটা বলতে পারি নি। হঠাৎ দূর থেকে আপনাকে দেখে কেন যেন মনে হল...

বাধা দিয়ে বললুম—আপনার স্বামীর বিপদ হয়েছে, একথা ভাবছেন কেন?

তৃণা বলল—ভাবতে বাধ্য হচ্ছি জয়ন্তবাবু। বললুম না, গতকাল

সন্ধ্যা থেকে এমন কতকগুলো ব্যাপার ঘটল—যাতে খুব অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলুম। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, কোন বিপদ ঘটবে। ওকে বারবার বললুম, চলো—আমরা ফিরে যাই। ও শুনল না।

—আপনারা কি এই প্রথম নীলাপুরমে এলেন? উঠেছেন কোথায়?

—হ্যাঁ। এই প্রথম। আমরা উঠেছি সি ভিউ হোটেলে।

—কোন বিশেষ কাজে, নাকি বেড়াতে?

—বেড়াতে।...বলে তৃণা ব্যস্ততার ভাব দেখাল।—জয়ন্তবাবু, আপনাকে আমি সবই বলব। এখন ওকে খুঁজে বের করতে আমায় একটু সাহায্য করুন।

চিন্তিত মুখে বললুম—তাহলে একটা কাজ করা যেতে পারে। থানায় যাওয়া যাক। কী বলেন? পুলিশকে সবটা জানানো দরকার। তারপর...

তৃণা বাধা দিয়ে বলল—না। প্লীজ! পুলিশকে আগেভাগে সব জানাতে গেলে অনেক গোলমালে পড়ে যাব।

—কিন্তু পুলিশের সাহায্য ছাড়া আমরা কতটুকু কী করতে পারি বলুন? আমিও তো এখানে নতুন এসেছি।

তৃণা আবার ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল—নীলাপুরম জায়গাটা তো ছোট্ট। আমি একা খুঁজে বেড়াতে সাহস পাচ্ছি না। পেতুম—যদি কাল রাতে ওই ব্যাপারগুলো না ঘটত! আপনি আমার সঙ্গে থাকলে আমার একটুও ভয় করবে না। প্লীজ, জয়ন্তবাবু!

এ একটা বিচিত্র ব্যাপাব সন্দেহ নেই। একলা হলে নিশ্চয় এমন সহজ শান্ত স্বরে কথা বলতে পারতুম না। উদ্বেগে অস্বস্তিতে আড়ষ্ট হয়ে পড়তুম। কিন্তু হাতে আমার তুরুপের তাস আছে—ওই বুড়ো ঘুঘুটি। ওঁর সঙ্গেই বেড়াতে এসেছি নীলাপুরমে। অমন ধুরন্ধর সাহসী প্রাজ্ঞের ব্যাকগ্রাউণ্ডে আমি অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারি।

কিন্তু বুড়ো আপাতত বাইরে থাক। দৈনিক সত্যসেবকের প্রখ্যাত ও ঝুঁদে রিপোর্টার জয়ন্ত চৌধুরী কি এত নাবালক যে এক ভদ্রমহিলার হারানো স্বামীর খোঁজে বেরিয়ে পড়তে পারবে না? অবশ্য, এমনও হতে পারে যে পথেই পুলকেশ মৈত্রের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! ব্যাপারটা ছুট করে চুকেও গেল।

পা বাড়িয়ে পরমুহূর্তে একটু আড়ষ্ট হলুম। কী ঘটেছিল গতরাতে? এক্ষুণি পথে যেতে যেতে নিশ্চয় জেনে নেব। সেটা কতটা বিপজ্জনক হবে কে জানে! যদি সত্যিসত্যি তেমন কিছু হয়, তাহলে পরিণামে বুড়ো ঘুঘুটিকে ডাকতেই হবে।

বাঁধের উপরে পাথরের চাওড়! তার উপরে বাধ। বাধের পরে একটা পাহাড়ের ঢালু গায়ে অ্যালবাট্রিস। তার পাশ দিয়ে একফালি পিচের পথ পাহাড়ের কাঁধ বরাবর এগিয়ে ওদিকে নেমে গেছে বড় রাস্তায়। পিচের সরু পথের দুধারে বড় বড় পাথর আর ঝোপঝাড়। সাবধানে ডানদিকে তাকাতে তাকাতে চলে গেলুম। বুড়ো আমাকে দেখতে পেল বলে মনে হল না। যতক্ষণ পাহাড়টা না পেরোলুম দুজনে কোন কথা হল না। বড় রাস্তার দুধারে সমতল জমিতে টাউনশিপ ও ছোট্ট বাজার। সেখানে পা দিয়ে মুখ খুললুম—দেখুন মিসেস মৈত্র, সবার আগে আমাদের একটা প্ল্যান করে নেওয়া দরকার। খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার কোন মানে হয় না। মিঃ মৈত্রের কি এখানে পরিচিত কেউ আছে? মানে—ওঁর মুখে তেমন কিছু কি শুনেছিলেন?

তৃণা মাথা নেড়ে বলল—না!

—তাহলে খুঁজবটা কী ভাবে? •

তৃণার মুখটা করুণ দেখাল। সে বলল—চলুন না, ওইসব লোককে জিগ্যেস করে দেখি। কারো না কারো সঙ্গে নিশ্চয় দেখা হয়েছে ওর। ছোট্ট জায়গা। বাঙালী তো নেই-ই।

হাসি পেল। হাসিটা চেপে বললুম—আচ্ছা, এমনও তো হতে

পারে উনি এতক্ষণ হোটেলে ফিরেছেন! চলুন না—হোটেলে আপনাদের রুমটা আগে দেখে আসি।

তৃণা একটু চঞ্চল হল। বলল—ঠিক বলেছেন! আমার মাথা ঘুরছে—সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! কিচ্ছু ভাবতে পারছিনে। চলুন, চলুন! কথাটা সত্যি আমার মাথায় আসে নি।

সে ব্যস্ত হয়ে বড় রাস্তা ধরে এগোল। সী ভিউ হোটেল পাহাড়ের উত্তর দিকে। আলবাট্রস পূর্বে। আলবাট্রস থেকে ওখানে যাওয়ার পথ নেই, যদিও বাড়ির মাথা নজরে পড়ে। আমরা অবশ্য উঠেছি সরকারী ডাক বাংলোয়। সেটা সমুদ্রের ধারে আরও খানিকটা উত্তরে সমতল জমির উপর। তার পিছনে সরকারী জঙ্গল আছে।

বাজারের মাঝামাঝি গিয়ে ডানদিকে, অর্থাৎ পূবে ঘুরে আগেরটার মতো সরু পিচের পথে উঠলুম। কিছু দূরে চড়াই ভেঙে উঠতে হল। এখানে ওখানে সুদৃশ্য কিছু বাড়ি আছে। মাঝেমাঝে গাড়ি আসছে যাচ্ছে। লোকজনের ভিড় আছে। নীচের দিকে চলেছে বা ফিরে আসছে। বছরের এসময়টা সমুদ্র বিলাসীদের ভিড় থাকে এখানে।

সী ভিউয়ের লাউঞ্জে ঢুকে তৃণা হন্তদন্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল রিসেপশানিস্ট মহিলাকে গুড ইভনিং মিস আয়ার। আমার স্বামী মিঃ মৈত্র কি ফিরেছেন?

গোমড়ামুখী দক্ষিণভারতীয় কৃষ্ণাঙ্গী ঘাড় নাড়ল মাত্র। তারপর কি বোর্ড থেকে চাবিটা দিল। তৃণা চাবি নিয়ে ব্যস্তভাবে পা ফেলল। কার্পেটমোড়া সিঁড়ি। দোতালায় তের নম্বর ঘরের দরজার সামনে সে একটু দাঁড়াল। হতাশভাবে মাথাটা দোলাল। মুখে ঘামের বিন্দু লক্ষ্য করলুম। নিঃশব্দে আমার দিকে তাকাল একবার। যেন বলল—দেখলেন তো ও ফেরেনি!

দরজা বাইরে থেকে বন্ধ আছে। অতএব ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু কী যেন ভাবল তৃণা। অস্ফুটস্বরে বলল—এক

মিনিটের জন্যে আসবেন ? সমস্ত ব্যাকগ্রাউণ্ডটা আপনাকে আগে বলা দরকার।

সে দরজা খুলল। ঢুকে আবার বলল - আসুন।

ভিতরে ঢুকে তাজ্জব বনে গেলুম। সী ভিউ হোটেলের খ্যাতির কথা জানা ছিল। কিন্তু এই ছোট্ট নীলাপুরের সমুদ্রতীরে কখনও পাঁচতারা মার্কা বড় হোটেলের বিলাস-আরাম আশা করি নি। মৈত্র দম্পতির এই স্যুটের মেঝে সবটা নকশা কার্পেটে মোড়া এবং জুতো কয়েক ইঞ্চি ডুবে যায়। ড্রইং রুম আর বেডরুম নিয়ে রীতিমতো চমৎকার ফ্ল্যাট। দেয়ালে দেশী বিদেশী আর্ট, কোণায় কোণায় অপূর্ব সব ফুলদানি এবং দামী আসবাবপত্র। আমার এই ভাবটা আঁচ করেই হয়তো তৃণা বলল --আমার স্বামী একটু বিলাসী প্রকৃতির মানুষ। আপনি বসুন না প্লীজ।

সে পুবের ব্যালকনির দিকে দরজা খুলে দিতেই সারা সমুদ্র ভেসে উঠল। কাছাকাছি একটা সোফায় বসে পড়লুম। সেই সময় হঠাৎ মনে হল, এখনই যদি মিঃ মৈত্র ফিরে আসেন, তৃণার উদ্বেগ ঘুচবে - কিন্তু আমি পড়ে যাব অস্বস্তিতে। কোন স্বামীই এ অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে অচেনা পুরুষকে দেখে খুশি হবে না। বিশেষ করে ঘরে যখন আর কেউ নেই এবং দরজাটা বন্ধ।

তাই, এই সান্নিধ্য যতই ভাল লাগুক--কিংবা পরিবেশ যত প্রীতিপদ হোক, শিগগির কেটে পড়া উচিত। বললুম - যাক্ গে। এবার সংক্ষেপে বলুন তো গতরাতে কী হয়েছে ?

তৃণার কপালে ভাঁজ দেখা দিল। তাকে অবশ্য চঞ্চল দেখাচ্ছিল বারবার। সে বলল --হ্যাঁ, বলছি। গত সন্ধ্যায় আমরা এখানে এসে উঠলুম। ঘরেই ডিনার সার্ভ করার ব্যবস্থা আছে--সে তো দেখতেই পাচ্ছেন। কিন্তু ও বলল---নিচের ডাইনিং হলে যাবে। চেনাজানা কেউ আছে নাকি দেখবে। ওর স্বভাবই এরকম। সব সময় হুল্লোড় পছন্দ করে। ড্রিংক করার অভ্যেসও আছে।

তৃণা এই কথাগুলো বলার সময় পুবে সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিল। নীচে পাহাড়টা ঢালু হয়ে নেমে আবার বেমক্কা ঢেউয়ের মতো উঁচু হয়ে গেছে। ওই অংশটা পাথরের চাতালের মতো। তার নীচে খাড়া দেয়াল, দেয়াল ছুঁয়ে বালির বীচ। সে কথা থামিয়ে হঠাৎ সেদিকে কী যেন দেখতে থাকল।

হেসে বললুম—কী? মিঃ মৈত্রকে দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়?

তৃণার মুখে কিন্তু অন্য ভাব। কেমন ভয়ার্ত চাহনি। ঠোঁট কাঁপছে মনে হল। সে সুরে চাপাস্বরে বলল-সেই লোকটা! বাইনোকুলার চোখে দিয়ে এদিকে কী দেখছিল। এইমাত্র সরে গেল।

চমকে উঠেছিলুম। বললুম—কে? কোন লোকটা? তারপর ব্যালকনিতে গিয়ে বাইনোকুলারওয়ালা কোন বদমাসকে দেখব বলে উঠতেই তৃণা সেদিককার দরজা বন্ধ করে দিল। কাঁপতে কাঁপতে বলল—না, না! আমার বড্ড ভয় করছে। আপনাকে মিঃ মৈত্র ভেবে যদি গুলি ছুঁড়ে বসে!

উত্তেজিত হয়ে বললুম—কেন গুলি ছুঁড়বে? ব্যাপারটা কি?

তৃণা বলল—বলছি, সব বলছি। আপনি বসুন প্লীজ। একটু ...একটু স্থির হতে দিন!

তার চেহারা লক্ষ্য করে ঘাবড়ে গেলুম। সে কাঁপছে, মুখটা সাদা হয়ে গেছে। টলতে টলতে সোফার কাছে এসে দাঁড়ালে বললুম—মিসেস মৈত্র! আপনি একটুও ভয় পাবেন না, অন্তত আমি থাকতে ভয় পাবার কিছু নেই। আপনি বসুন, বসে সব বলুন।

তৃণা বসল না। ভয়ার্ত মুখে আমার দিকে তাকাল শুধু।

বললুম—আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কারণ, শুধু আমি নই—আমার সঙ্গে নীলাপুরমে যিনি এসেছেন, তাঁর নাম আপনি শুনে থাকবেন—কর্নেল নীলাদ্রি সরকার—প্রখ্যাত প্রাইভেট গোয়েন্দা!...

তৃণা বলে উঠল—গোয়েন্দা!

—হ্যাঁ। অ্যালবাট্রসের লনে নিশ্চয় কোন টাকমাথা বুড়ো ভদ্রলোককে দেখে থাকবেন! মুখে সাদা দাড়ি আছে। মাঝারি গড়ন—একটু ঝুঁকে থাকেন। ইউরোপীয়ান বলে ভুল হতে পারে কিন্তু।

—যেন দেখেছিলুম!...হ্যাঁ, হ্যাঁ—দেখেছি।

—উনিই আমার ফ্রেণ্ড ফিলসফার এ্যাণ্ড গাইড বলতে পারেন। আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। এক্ষুণি ওঁকে আমি খবর দিতে পারি। দেব?

তৃণা একটু ভেবে বলল—দেখুন, আমার মনে হচ্ছে—ব্যাপারটা নিয়ে এত শিগগির হইচই করলে নিশ্চয় আমাদের কোন ক্ষতি হবে। আপনি আগে সবটা শুনুন। তারপর যদি মনে হয়, তাঁকে জানানো দরকার—জানাব।

—বেশ, বলুন।

তৃণা নড়ে উঠল হঠাৎ। করুণ ধরনের হাসল।—এই দেখুন! আমি কী ভীষণ অভদ্র! আমার ঘরে এসে—আর আমি সব ভদ্রতা ভুলে বসেছি! এক মিনিট!

বলে সে কোণার টেবিল থেকে ফোনটা তুলল। তারপর আমার দিকে ঘুরল। মুখটা আবার ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে।

একটু বিস্মিত হয়ে বললুম—কী ব্যাপার?

ফোনটা রেখে সে ব্যস্তভাবে বলল—আশ্চর্য তো! ফোনটা ডেড।

—ডেড?

—হ্যাঁ। এক মিনিট...আমি দেখছি। করিডোরে বেয়ারারা কেউ আছে নাকি!

সে দরজার দিকে যাচ্ছে দেখে বললুম—কলিং বেল নেই!

—তাই তো! সরি!...বলে তৃণা কাছেই দেয়ালে বোতাম টিপল।

কোন শব্দ শোনা গেল না। আরও কয়েকবার টিপল, তবুও না। সে আমার দিকে ফ্যাকাসে মুখে তাকাল। আমি ততক্ষণে বেশ ঘাবড়ে গেছি। বললুম—আশ্চর্য তো! আচ্ছা—দেখছি!

উঠে আলোর সুইচ টিপলুম। জ্বলল না। সেই সময় চোখে পড়ল স্যুটে এয়ার-কনডিশানের ব্যবস্থা আছে। হন্তদন্ত হয়ে যন্ত্রটার চাবি ঘোরাতে শুরু করলুম। কোন সাড়া নেই। তখন দুঃখে বললুম—লোডশেডিং চলছে না তো?

তারপর দেখলুম তৃণা দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

বাইরে রোদ মুছে গেছে ততক্ষণে। ঘরের ভিতরটা ধূসর হয়ে উঠেছে। বালকনির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতে দেখতে তৃণার অপেক্ষা করতে থাকলুম। একটা রহস্যময় ঘটনার মধ্যে এসে পড়েছি, তাতে কোন ভুল নেই। মনে মনে কর্ণেল বুড়োর উদ্দেশে বললুম—ওহে বৃদ্ধ ঘুঘু, তুমি সব সময় আমাকে অতি বুদ্ধিমান বলে ঠাট্টা করো। আমি গোয়েন্দা হলে নাকি বিস্তর ওলট পালট কাণ্ড ঘটবে! হুঁ—এবার তুমি বসে বসে দেখবে, গোয়েন্দা হবার এবং রহস্যের পর্দা ফাঁস করবার মতো বুদ্ধি জয়ন্তের ঘিলুতে প্রচুর পরিমাণেই আছে। মাননীয় গোয়েন্দামহোদয়! অপেক্ষা করো এবং দেখ!

কিন্তু তৃণা ফিরছে না। পাঁচ মিনিটের বেশি অপেক্ষা করেও তার কোন পাত্তা নেই। তখন উদ্বিগ্ন হয়ে পায়চারি শুরু করলুম। সেই সময় একটা আইডিয়া মাথায় এল। এখন তো তদন্তের চমৎকার সুযোগ হাতে পাওয়া গেছে! এই দম্পতির ব্যাকগ্রাউণ্ডটা জানার মতো কোন জিনিস কি স্যুটে নেই? ওদের বাক্সোপেঁটরা হাতড়ে দেখা যাক্ না।

যেমন কথাটা মাথায় আসা, অমনি ছুটে করে বেডরুমে ঢুকে পড়লুম। চমৎকার আধুনিক উপকরণে সাজানো ঘর। সঙ্গে টয়লেট। তার দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে আছে। আলো খুব কম। কিন্তু ওই ফাঁকে স্পষ্ট একজোড়া জুতো-পরা পা দেখতে পেলুম।

পাছুটো মেঝেয় শুয়ে থাক। মানুষের।

বুকের মধ্যে রক্ত শিসিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। এক লাফে এগিয়ে দরজাটা পুরো ফাঁক করতেই যা দেখলুম, তাতে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল।

স্যুটপরা এক ভদ্রলোক চিত হয়ে পড়ে আছেন। কপালে ছুটো রক্তাক্ত ক্ষত। একপাশে একটা রিভলবার পড়ে আছে।

ওটা মৃতদেহ তাতে কোন ভুল নেই। প্রথমে ঝোঁকের বশে রিভলবারটা তুলে নিলুম। আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম সেটার দিকে।

অ্যালবাট্রসের লনে বেঞ্চে বসে শেষ বেলায় দরদর করে ঘামছি আর কর্ণেল বুড়ো আমাকে প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। যন্ত্রের মতো জবাব দিচ্ছি। গোড়ায় উনি হাসছিলেন। ক্রমশ দেখলুম, ওঁর হাসিটা মিলিয়ে গেল। গম্ভীর মুখে বললেন—তাহলে রিভালবারটা তুমি হাতে নিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—এমনি। হঠাৎ যেন পরীক্ষা করতে ইচ্ছে হল।

—বোকার মতো কাজ করেছ ডার্লিং!

—সে তো এখন বেশ বুঝতে পারছি।

—আসার সময় করিডোরে কেউ তোমাকে বেরিয়ে আসতে দেখেনি?

—সম্ভবত না।

—সম্ভবত কেন?

—তখন তো আমি ভীষণ ভয় পেয়ে পালিয়ে আসছি। খুঁটিয়ে দেখার মতো মনের অবস্থা ছিল না।

—হুম। সিঁড়িতে কারও সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—হ্যাঁ। একজন বেয়ারার সঙ্গে। সে চায়ের ট্রে নিয়ে উঠছিল।

আমার সঙ্গে তার একটু ধাক্কা লাগে।

কর্নেল আরও গম্ভীর হয়ে বললেন—রিসেপশনে মিসেস মৈত্রের সঙ্গে দেখা হয়নি বলছ। রিসেপশনিস্ট মেয়েটিকে ওঁর কথা জিজ্ঞেস করেছিলে?

—না। তখন আমার মনের অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন।

—হুম!...বলে কর্নেল আপনমনে মাথা দোলালেন। তারপর বললেন—খুব বোকার মতো কাজ করেছ, জয়ন্ত। তুমি এমন বোকামি করবে, তা ভাবাই যায় না। পারিপার্শ্বিক এভিডেন্সে তোমাকেই খুনী সাব্যস্ত করা এখন খুবই সহজ।

শিউরে উঠে বললুম—সর্বনাশ!

—রিভলবারে তোমার আঙুলের ছাপ রয়েছে। কাজেই জজসাহেব তোমাকে অনায়াসে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারেন।

এই অব্দি শুনেই আঁতকে উঠে বললুম—ওরে বাবা! তাই তো!

কর্নেল এবার উঠে দাঁড়ালেন। পা বাড়িয়ে বললেন—এস, দেখা যাক কী করতে পারি!

দুজনে অ্যালবাট্রসের লাউঞ্জে ঢুকে সোজা রিসেপশনে গেলুম। তারপর কর্নেল ফোন তুলে ডায়াল করতে থাকলেন। আমি উদ্বিগ্নমুখে কাচের দেয়ালের বাইরে সমুদ্র দেখতে থাকলুম। হঠাৎ চোখে পড়ল, বাঁদিকে দূরে সমুদ্রের খাড়ির উপর পাথরের চাতালে কে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার চোখে বাইনোকুলার। সমুদ্রের দিকে পিছু ফিরে দাঁড়িয়ে সে কী যেন দেখছে। তৃণা যাকে সী ভিউ থেকে দেখেছিল, নিশ্চয় ওই লোকটা সেই। ওখানেই তো পাহাড়ের পিঠে সী ভিউ হোটেলটা রয়েছে—এখান থেকে যদিও সেটা দেখা যাচ্ছে না। তৃণা বলেছিল—লোকটা গুলি ছুঁড়তে পারে। কিন্তু তৃণাই বা হঠাৎ উধাও হল কেন?.....

কর্নেলের ডাকে সম্বিৎ ফিরল। চাপাস্বরে বললুম—কর্নেল! ওই দেখুন সেই লোকটা!

কর্ণেল গম্ভীর মুখে বললেন—জয়ন্ত, থাক্। আর গোয়েন্দাগিরি করতে যেও না। কেউ বাইনোকুলার দিয়ে কী দেখছে, তাতে আপাতত তোমার কিছু সুবিধে হবে না। এখন চলো, আমরা সী ভিউতে যাই। পুলিশ অফিসাররা এখনই সেখানে এসে পড়বেন।

ইতস্তত করে বললুম—কিন্তু আমার যাওয়া কি ঠিক হবে?

—হ্যাঁ। তোমার গ্রেফতার হবার সম্ভাবনাটা তো আছেই।

বুক ঢিপঢিপ করতে থাকল। বললুম—তাহলে আমি বরং ঘরে গিয়ে থাকি।

—মোটেও না।...বলে কর্ণেল আমার ডানহাতের কব্জি চেপে ধরলেন এবং বলির পাঁঠার মতো আমাকে টানতে টানতে বেরোলেন।

আগের রাস্তা দিয়ে ঘুরে আমরা সী ভিউ পৌঁছলুম। কিন্তু এখন সেখানে অন্য দৃশ্য। ছোটখাটো একটা ভিড় জমে আছে। ভিড়টা চাপাগলায় কী সব আলোচনা করছে। মাদ্রাজী রিসেপশনিস্ট মিস আয়ার শুকনো মুখে ফোন ধরে কার সঙ্গে কথা বলছে। বেয়ারারা সিঁড়িতে হন্তদন্ত হয়ে উঠছে আর নামছে। কর্ণেল মিস আয়ারকে কিছু বলার জন্যে ঠোঁট ফাঁক করছেন, এমন সময় একজন বেয়ারা আমার দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে উঠল—এই লোকটা! এই লোকটা! মিস আয়ারও ঘুরে আমাকে দেখেই বলে উঠল—মাই গড! এই তো সেই লোক!

অমনি বেয়ারার দল তুমুল হইচই করে আমাকে ঘিরে ফেলল। দারোয়ানকেও দেখলুম এগিয়ে আসতে। আমি বিকট চেঁচিয়ে বললুম—আমি নই, আমি নই!

ভিড়সুদ্ধ পাল্টা চেঁচালো—পাকড়ো! পাকড়ো! শালা খুনী-লোগকো পাকড়ো!

ভয়ে চোখ বুজে ফেললুম। মুখের সামনে অনেকগুলো হাতের

মুঠো নড়ছিল। প্রচণ্ড মার আমাকে দেবেই—এই ভয়েই চোখ বুজে ফেললুম। অমনি শুনি কর্ণেল তাঁর সামরিক গর্জনে সী ভিউকে যেন ফাটিয়ে দুভাগ করে ফেললেন—খবর্দার! যে যেখানে আছেন, চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে থাকুন। যা করার, পুলিশকে করতে দিন।

মারমুখী ভিড়টা হচকচিয়ে গেল। তারপর দেখি, লন থেকে কয়েকজন পুলিশ অফিসার আর কনেস্টবল হন হন করে এগিয়ে আসছে। একজন অফিসার কর্ণেলের সামনে এসেই হাত বাড়ালেন—হ্যাল্লো ওল্ড বস! এবারও দেখছি, আসামাত্র খুন খারাপি করে ফেলেছেন!

কর্ণেল একটু হেসে করমর্দন করে বললেন—হ্যাঁ, মিঃ ভেঙ্কটেশ! এই আমার ভাগ্য। যেখানে যাই, সেখানেই এক ইটার্নাল মার্ডারার আড়াল থেকে একটা ডেডবডি সামনে ফেলে দিয়ে তামাশা করে।

ভেঙ্কটেশ বললেন—তাই বটে! চলুন, দেখি।···

বেয়ারারা আগে আগে উঠতে থাকল। তিনজন পুলিশ অফিসার, কর্ণেল আর আমি তৃণা মৈত্রের ঘরে চললুম। নীচে দুজন অফিসার আর কনেস্টবলরা রয়ে গেল। আর কাউকেও উঠতে দেওয়া হল না।

সেই ভয়ঙ্কর ঘরে ঢুকতেই আমার দম আটকে এল। তবে একদিক থেকে আশ্বস্ত বোধ করছিলুম যে বেয়ারাদের করিডোরে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা আমাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে এখনও খুব ছটফট করছে নিশ্চয়। ভাগ্যিস, কর্ণেল সঙ্গে আছেন।

বাথরুমে লাশটা তেমনি পড়ে আছে। কিন্তু এবার নতুন দৃশ্য চোখে পড়ল। লাশের ওপর মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সেই তৃণা মৈত্র। ভেঙ্কটেশ ঝুঁকে ওর নাড়ি দেখে নিয়ে বললেন—শক খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। মিঃ আচারিয়া। আপনি দেখুন—ডাক্তার এলেন নাকি।

একজন অফিসার তক্ষুণি চলে গেলেন। কর্ণেল ও ভেঙ্কটেশ

তৃণাকে সাবধানে তুলে সংলগ্ন বেডরুমের খাটে শুইয়ে দিলেন। কর্ণেল বললেন—জয়ন্ত। ওই গ্লাসে জল ঢালো। কর্ণেলের হুকুম তামিল করছি, সেই সময় বাথরুমে ভেঙ্কটেশের কথা শুনে চমকে উঠলুম।—কী আশ্চর্য। এটা দেখছি একটা খেলনা রিভলবার।

কর্ণেল বললেন—টয় রিভলবার। মাই গুডনেস।

হ্যাঁ, কর্ণেল।

—ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো।.. বলে কর্ণেল আমার হাত থেকে জলের গ্লাস নিয়ে তৃণার মুখে জলের ঝাপটা দিলেন।

একটু পরেই তৃণা চোখ খুলল। অস্বাভাবিক লাল চোখ। নিষ্পলক তাকিয়ে সে কর্ণেলকে দেখল। তারপর আমাকে দেখেই আর্তনাদ করে উঠল—ওই, ওই লোকটা ওকে খুন করেছে। পুলিশ! পুলিশ!

আঁতকে উঠে বললুম—ছি ছি! কী সব যা-তা বলছেন। আপনিই তো আমাকে……

ভেঙ্কটেশ ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়েছেন। কর্ণেল চোখ টিপে আমাকে থামতে ইশারা করলে আমি থেমে গেছি। তৃণা দুহাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কাঁদতে থাকল। কান্নার মধ্যে যা বলছে, তা একটু একটু বুঝতে পারছি। এখনও কেন আমাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না, এই অভিযোগ করছে সে। এতক্ষণ ভয় পাচ্ছিলুম, কিন্তু এবার রাগ এসে সাহস বাড়াল। মনে মনে বললুম—শয়তানী, এ সবই তোমার ষড়যন্ত্র। নিজের স্বামীকে এভাবে খুন করিয়ে কারও কাঁধে চাপাবার মতলব করেছিলে। সেই মতলবে তুমি সী বীচে গিয়ে উপযুক্ত লোক খুঁজছিলে। আমিও বোকার মতো তোমার ফাঁদে ধরা দিতে এসেছিলুম। রোস, তোমার মজা দেখাচ্ছি।

কর্ণেল বললেন—মিঃ ভেঙ্কটেশ, একটু পরেই ব্যাকগ্রাউণ্ডটা আপনাকে জানাব। আপাতত আপনি আপনার কর্তব্য করতে থাকুন।……

সী ভিউয়ের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে রিসেপশনের পিছনে ম্যানেজারের ঘর। ম্যানেজার ভদ্রলোক বাইরে গিয়েছিলেন। এসে সব দেখে শুনে অনবরত ঠকঠক করে কাঁপছেন। ওঁর ঘরেই জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। আমার স্টেটমেণ্ট ও জেরাপর্ব চুকে যাবার পর তৃণা মৈত্রকে ডাকা হল। তখন সন্ধ্যা সাড়ে ছটা। বাইরে সমুদ্র অন্ধকারে গর্জন করছে। হোটেলের সবগুলো আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তৃণা আস্তে আস্তে মিস আয়ারের কাঁধে হাত রেখে ঘরে ঢুকল। মিস আয়ার চলে গেলে ভেঙ্কটেশ বললেন—বসুন মিসেস মৈত্র। খুব দুঃখিত আমি—আপনার মনের অবস্থা জেনেও আপনাকে বিব্রত করা হচ্ছে। কিন্তু এটা কর্তব্য। তাই ক্ষমা করবেন।

তৃণা বসে বলল—বলুন, কী জানতে চান।

—আপনারা কবে এসেছেন এখানে?

—সে তো হোটেলের রেজিস্টারে পাবেন। গতকাল সন্ধ্যা ছটা নাগাদ।

—আপনি জয়ন্তবাবুকে বলেছিলেন, আপনার আসার পর কী সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। কী ঘটনা?

তৃণা একটু ভেবে নিল যেন। তারপর বলল—কাল রাতে দুবার আমাদের দরজায় কে নক করেছিল। উনি দুবারই দরজা খুললেন, কিন্তু কাকেও দেখতে পেলেন না। প্রথমবার রাত নটায়, দ্বিতীয়বার সাড়ে দশটায়। আজ সকালে ব্যালকনিতে দুজনে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ আমার চোখে পড়ল একটা লোক খাড়ির উপরে পাথরের চাতাল থেকে বন্দুক তাক করছে। উনিই দেখতে পেলেন। অমনি আমাকে টেনে বসে পড়লেন। সেই অবস্থায় গুঁড়ি মেরে আমরা ঘরে ঢুকলুম। উনি ভীষণ কাঁপছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করেও কোন জবাব পেলুম না।

—বেশ। তারপর? আর কী ঘটনা ঘটল, বলুন।

—নীচের ডাইনিংয়ে আজ দুজনে লাঞ্চ খেতে এসেছি, একজন বেয়ারা ওঁর হাতে একটা চিঠি গুঁজে দিল। লাউঞ্জে কে একজন তাকে নাকি দিয়েছে চিঠিটা! চিঠি পড়ে ওঁর মুখ শুকিয়ে গেল যেন। জিজ্ঞেস করলুম—কিন্তু এবারও কোন জবাব দিলেন না। শুধু বললেন—পরে সব বলব। তারপর খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলেন। লাউঞ্জে গিয়ে দেখলুম—সত্যি, এক ভদ্রলোক বসে আছেন। মিঃ মৈত্র আমাকে ঘরে যেতে বলে ওই ভদ্রলোকের কাছে গেলেন। আমি আমার স্বামীর কোন ব্যাপারে কখনও কৌতূহল প্রকাশ করি নি। কিন্তু এবার খুব উদ্বিগ্ন বোধ করছিলুম। আধঘণ্টা পরে উনি ফিরলেন। তারপর বললেন—একটু কাজে বাইরে যাচ্ছি। শিগ্‌গির ফিরব। ভেবো না। তখন প্রায় দুটো। পাঁচটা পর্যন্ত যখন ফিরলেন না, তখন উদ্বিগ্ন হয়ে বেরিয়ে পড়লুম। তারপর ওই ভদ্রলোক—জয়ন্তবাবুর সঙ্গে দেখা হল।…

ভেঙ্কটেশ হাত তুলে বললেন—এবার, আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন। জয়ন্তবাবুকে ঘরে বসিয়ে রেখে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

তৃণা মুখ তুলে নিষ্পলক তাকাল। বলল—আমাদের রুমের ইলেকট্রিক কানেকশান কাটা দেখে নীচে বলতে এসেছিলুম। কিন্তু লাউঞ্জে নেমেই চোখে পড়ল, সেই পাথরের চাতালে সকালের বন্দুকঅলা লোকটা আর কে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার চেহারা অবিকল মিঃ মৈত্রের মতো—পোশাক একই রকম। বেশ খানিকটা দূর বলে স্পষ্ট চেনা যাচ্ছিল না। তাই তক্ষুণি দৌড়ে সেদিকে গেলুম। কিন্তু আমি যেতে যেতে ওরা পাথরের আড়ালে চলে গেল। তখন কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে হোটেলে ফিরে এলুম। এসেই দেখি…

সে দুহাতে মুখ গুঁজে হু হু করে কেঁদে উঠল। ভেঙ্কটেশ বললেন—প্লীজ মিসেস মৈত্র। আমাদের আরও অনেক কিছু জানবার আছে। আপনার স্বামীর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে আপনার

সাহায্য খুবই দরকার।

তৃণা ভেজা চোখ তুলে বলল—বলুন, আর কী জানতে চান।

আপনার স্বামীর পেশা কী ছিল?

—স্থায়ী কিছু ছিল না। খুব খেয়ালী মানুষ। নানারকম ট্রেডিং এজেন্সি নিয়ে থাকতেন। সম্প্রতি নতুন কোন ব্যবসা করার কথা ভাবছিলেন।

এবার কর্ণেল বললেন—হুম! মিসেস মৈত্র, আপনার স্বামী নীলাপুরমে কেন এলেন, আপনি নিশ্চয় জানেন।

তৃণা ঘাড় নাড়ল।—জানি না। আমি কখনও ওকে প্রশ্ন করতুম না। এটা আমার স্বভাবও বটে—তাছাড়া প্রশ্ন করলেই উনি বলতেন—পরে বলব 'খন। এবার হঠাৎ নীলাপুরমে আসবেন বললেন, তখন আমি কোন প্রশ্ন করি নি।

—আপনার স্বামীর কি কোন শত্রু ছিল জানেন?

—না। থাকলেও আমাকে বলেন নি।

—আপনার স্বামীর নিশ্চয় বন্ধুবান্ধব ছিলেন?

—হ্যাঁ, তা ছিলেন বই কি। তবে উনি খুব ব্যস্ত মানুষ ছিলেন। আড্ডা দিতে

—খুব ঘনিষ্ঠ এমন কারও কারও নাম নিশ্চয় বলতে পারবেন?

—পুরো নাম আমি বলতে পারব না। যেমন এক ভদ্রলোক মাঝে মাঝে আমাদের কলকাতার বাসায় আসতেন। অবনীবাবু নাম। আরেকজন আসতেন—তাঁর নাম মিঃ বক্সিত।

—আপনারা কোন্ ট্রেনে এসেছেন হাওড়া থেকে?

তৃণা একবার ওঁর দিকে তাকিয়ে বলল—কেন?

—এমনি জিজ্ঞেস করছি।

—হাওড়া থেকে ডিরেক্ট আসা যায় না কোন ট্রেনে।

—সরি! বলে কর্ণেল একটু হাসলেন।—বিন্ধ্যাচল-অব্দি আসা যায়। বিন্ধ্যাচলে কখন নেমেছিলেন?

—গতকাল তিনটে পাঁচ-টাচ হবে।

—আপনার স্বামীর সঙ্গে কারও দেখা হয়েছিল ওখানে?

তৃণা নড়ে উঠল।—হ্যাঁ, হ্যাঁ। হয়েছিল। আমি ভুলে গেছি বলতে—মানে, ওই খাড়ির উপরকার চাতালে যে লোকটাকে দেখেছি, তারই সঙ্গে। বিন্ধ্যাচল স্টেশনে ওকে দেখেই উনি এগিয়ে গেলেন। আমাকে বললেন—তুমি এখানে একটু দাঁড়াও। আমি আসছি। পনের কুড়ি মিনিট লোকটার সঙ্গে কথা বলে ফিরে এলেন। তখন ওঁকে কেমন উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল।

কর্নেল শুধু বললেন—হুম! আমার আর কোন প্রশ্ন নেই। মিঃ ভেঙ্কটেশ, ইউ প্রসিড।

ভেঙ্কটেশ ঘড়ি দেখে বললেন—মিসেস মৈত্র, আপাতত এই। আপনি ওখানে গিয়ে বসুন। মিঃ আচারিয়া, এবার ডাকুন বেয়ারা রণদীপকে।

রণদীপ বয়সে তরুণ। ঘরে ঢুকে সেলাম করার পরই তার চোখ গেল আমার দিকে। অমনি ওর ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। নির্ঘাৎ ও ব্যাটা আমাকে তখন বেরিয়ে আসতে দেখেছিল ঘর থেকে। সে দাঁড়িয়ে রইল। ভেঙ্কটেশ তাকে বসতে বললেও সে বসল না। তখন একটু হেসে ভেঙ্কটেশ বললেন—তুমি রণদীপ সিং?

—জী হাঁ।

—কতদিন সী ভিউতে এসেছ?

—তা বছর খানেক হয়ে গেল স্যার।

—গতকাল তোমার ডিউটি ছিল কখন?

—ছটা থেকে রাত একটা।

—ওই সময়ের মধ্যে মিঃ মৈত্র ছাড়া নতুন কেউ এসেছিলেন হোটেলে?

—দুজন সাহেব এসেছিলেন, ওনারা এখনও আছেন। তবে রেজিস্টার দেখলেই সব মালুম হবে, স্যার।

—ঠিক বলেছ। আচ্ছা রণদীপ, ওই সময়ের মধ্যে মিঃ মৈত্রের ঘরে—মানে তের নম্বর ঘরে কাউকেও নক করতে বা ঢুকতে দেখেছিলে?

—না স্যার। আমি তো হরদম করিডোরেই ঘুরি।

—আজ কখন ডিউটি তোমার?

—দুপুর দুটো থেকে রাত নটা অব্দি আছে, স্যার।

—এই সময়ের মধ্যে কাউকে তের নম্বরে…

বাধা দিয়ে রণদীপ আমার দিকে আঙুল তুলল। ওই যে স্যার…

—না। উনি ছাড়া আর কেউ ঢোকে নি?

—ঢুকেছিলেন। কিন্তু…

ওকে থামতে দেখে কর্ণেল ঝুঁকে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন—যিনি ঢুকেছিলেন, তাকে আর নিশ্চয় বেরোতে দেখ নি? তাই না?

রণদীপের ঠোঁট কাঁপছে। সে কী বলতে চায়, অথচ পারছে না—খুব অবাক আর হতভম্ব যেন।

কর্ণেল বললেন—এবং যাকে ঢুকতে দেখেছিলে, তারই লাশ বাথরুমে দেখা গেল। তাই তো রণদীপ?

রণদীপ লাফিয়ে উঠল—হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। তাই বটে স্যার। এতক্ষণ সেটা খেয়াল হয় নি স্যার!

ঘরে সবাই নড়ে উঠেছিল—তারপর ভীষণ স্তব্ধতা। ভেঙ্কটেশ শুধু বললেন—মাই গুডনেস!

তারপর শুনলুম তৃণা মৈত্র চিৎকার করে উঠল—মিথ্যা! একেবারে মিথ্যা! যে খুন হয়েছে, সেই আমার স্বামী!

তারপর দেখলুম সে অজ্ঞান হয়ে কোণার সোফা থেকে মেঝেয় পড়ে গেল। কর্ণেল আমাকে ডেকে বললেন—এস জয়ন্ত। বাইরে যাই। মিঃ ভেঙ্কটেশ, দরকার হলে রিং করবেন—কিংবা আসতেও পারেন। ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম। অ্যালবাট্রস—রুম নম্বর

থি । ' অ রিভোয়া !

রাস্তায় পেঁৗছে কর্ণেল বললেন—জয়ন্ত, কী ভাবছ ?

—ভাবছি, লাশটা তবে পুলকেশ মৈত্রের নয় ?

—না। তৃণার স্বামীর নয়।

—কিন্তু এর মানেটা কী ?

—মানে এখনও বোঝা যাচ্ছে না। মাথাটা পরিষ্কার করা দরকার। তাই ডার্লিং, চলো—আমরা একবার ওই খাড়ির উপর পাথরের চাতালে গিয়ে কিছুক্ষণ বসি। জায়গাটা ভারি চমৎকার।

একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। বললুম—বন্দুক আর বাইনোকুলারধারী কারো পাল্লায় পড়ব না তো ? কর্ণেল হেসে বললেন তোমার দৃষ্টি-বিভ্রম নয় তো জয়ন্ত ?

—মোটেও না। স্পষ্ট দেখেছি একজন নীল শার্ট পরা লোক চোখে বাইনোকুলার রেখে দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্য, তার হাতে বন্দুক দেখি নি।

পাহাড়ের ঢালুতে নামতে গিয়ে হঠাৎ কর্ণেল বললেন—বরং তার আগে একবার ওই দি সোয়ান নামে হোটেলটা থেকে ঘুরে আসি।

—হঠাৎ ওখানে কেন ?

নিছক বিয়ার খেতে।

দুজনে সোজা এগিয়ে সেই খাড়ির খানিকটা উত্তরে দি সোয়ান নামে ছোট্ট হোটেলের দিকে এগোলুম।

হোটেলটা বাংলোবাড়ির মতো। লাউঞ্জে তেমন ভিড় নেই। একপাশে বার। বারে ঢুকে দেখলুম যা ভিড় তা এখানেই। নীল আলোয় মৌমাছির মতো একঝাঁক মাতাল গুঞ্জন করছে। চাপা সুরে বিলিতি অর্কেস্ট্রা বাজছে। আমরা খালি টেবিল খুঁজতে খুঁজতে কোণায় চলে গেলুম। একটা টেবিলে একজন লোক একা বসে আছে। টেবিলের গ্লাসে রঙীন মদ। কর্ণেল ভদ্রতা করে বললেন—

বসতে পারি স্তার ?

লোকটা ঘাড় নাড়ল মাত্র। তারপর গেলাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিল।

আমরা বসে পড়লুম। বেয়ারা আমাদের পেছন পেছন এসে দাঁড়িয়ে ছিল। কর্ণেল তাকে বিয়ার দিতে বললেন। এই সময় আমার চোখে পড়ল তৃতীয় চেয়ারের ওই লোকটার কোমরের কাছে একটা বাইনোকুলার ঝুলছে। অমনি শিউরে উঠে কর্ণেলের উরুতে চিমটি কাটলুম। কর্ণেল কিন্তু গ্রাহ্যই করলেন না। নির্বিকারে দাড়িতে হাত বুলোতে থাকলেন। তখন আমি লোকটাকে আরও ভাল করে লক্ষ্য করতে থাকলুম। দূর থেকে কম আলোয় দেখেছি, ভুল হতেও পারে। কিন্তু এর পোশাকও স্পষ্ট বলে দিচ্ছে পাথরেব চাতালে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিই বটে। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে ওর। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। মুখের চামড়ায় পোড়খাওয়া ভাব আছে। খাড়া নাক আর চৌকো চোয়াল দেখে সহজেই বোঝা যায় লোকটা ডানপিটে না হয়ে পারে না।

বিয়ার এসে গেল। কর্ণেল বোতল থেকে গ্লাসে খানিকটা বিয়াব ঢেলে বললেন—জয়ন্ত নিশ্চয়ই এই নিরামিষ পানীয়ে সন্তুষ্ট হবে না ?

কর্ণেল আমার চিমটিতে সাড়া দেন নি বলে ক্ষুব্ধ ছিলুম। তাই গম্ভীর হয়ে মাথাটা দোলালুম মাত্র—তার মানে হ্যাঁ এবং না দুই-ই হতে পাবে। কর্ণেল একটু হেসে গ্লাসটা তুলে 'চিয়ার্স' বলে চুমুক দিলেন।

এই সময় তৃতীয় চেয়ারের লোকটা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তারপর বেরিয়ে গেল। তখন ব্যস্ত হয়ে চাপা গলায় বললুম—যাঃ। চলে গেল যে!

কর্ণেল গ্লাসের দিকে তাকিয়ে বললেন—কে গেল, ডার্লিং ?

ক্ষেপে গিয়ে বললুম—ন্যাকামি করবেন না। সেই বাইনোকুলারঅলা লোকটা এতক্ষণ দিব্যি আপনার সামনে জলজ্যান্ত বসে

রইল—আমি আপনাকে চিমটি কাটলুম, অথচ গ্রাহ্য করলেন না।

কর্ণেল একটু হেসে বললেন—তুমি কি ভাবছ খাইনোকুলার সঙ্গে থাকলেই তাকে খুনী বলে সন্দেহ করতে হবে?

—নিশ্চয়। ওই লোকটাই তো তখন খাড়ির ধারে দাঁড়িয়ে…

কর্ণেল হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরে বললেন—চুপ। তারপর অদ্ভুত ভঙ্গিতে চোখের তারা ঘুরিয়ে ওঁর ডান-দিকটা নির্দেশ করলেন। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি ওই টেবিলে তিনজন লোক বসে আছে। দুজন সর্দারজী, অন্য একজন ধুতিপাঞ্জাবি পরা বাঙালী ভদ্রলোক। বাঙালী ভদ্রলোকটি যে সর্দারজীদের সঙ্গে আসেন নি, তা দেখামাত্র বোঝা যায়। উনি আপনমনে একটা পেন দিয়ে একটুকরো কাগজে কাটাকুটি করছেন। পাশের গ্লাসে মদ। মুখের ভাবভঙ্গি দেখেই বুঝলুম, প্রচণ্ড নেশা হয়ে গেছে। কাগজের টুকরোটা বারেরই বিল মনে হল। তার উপরে যেভাবে কলম চালাচ্ছেন,—বাঙালী যে জাত কেরানী তা নির্দ্বিধায় প্রমাণ করা যায়। আমি আর হাসি চাপতে পারলুম না।

হাসি শুনেই ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকালেন। দেখি, উনিও গদগদ হয়ে হাসছেন। মাতালের এমন হাসি আমার পরিচিত। আমি ওঁর কাজে সায় দেবার ভঙ্গিতে মাথা দোলালুম। ভদ্রলোক শুধু মাতাল নন, খুবই রসিক। অমনি দ্বিগুণ উৎসাহে কলম চালনা শুরু করলেন এবং মাঝেমাঝে মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। এমন মজা পেলে ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

ব্যাপারটা সর্দারজীদের চোখে পড়ল এতক্ষণে। একজন ভুরু কুঁচকে অস্পষ্ট কিছু বলল। মুখে বিরক্তির চিহ্ন।

হঠাৎ কর্ণেল উঠে দাঁড়ালেন।—আমি একবার বেরুচ্ছি, জয়ন্ত। তুমি আমার জন্যে এখানেই অপেক্ষা করো। বার দশটা অব্দি খোলা। আমি সাড়ে নটার মধ্যেই ফিরব।

আমাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই বেরিয়ে গেলেন

উনি। আমার ক্ষোভ হল বুড়োর ওপর। কিন্তু কী আর করা যাবে? ওঁর কথামতো না চললে উনিও বড্ড বিরক্ত হবেন। বিশেষ করে খুনখারাপির তদন্তের ব্যাপারে উনি তখন অন্যমানুষ। তাই বসে থাকতে হল।

এই অবস্থায় ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাব না জমিয়ে উপায় নেই। নিঃসঙ্কোচে বললুম—চলে আসুন না এখানে!

ভদ্রলোক যেন সেটাই চাইছিলেন। টলতে টলতে কলম কাগজ আর গেলাস নিয়ে আমাদের টেবিলে এলেন। তারপর নমস্কার করে বললেন—বাঁচলুম। আমার নাম পরিতোষ কারফর্মা। টালিগঞ্জে কাঠগোলা আছে। মশাই যে বাঙালী, তা আঁচ করেছিলুম। কিন্তু বুঝলেন? ওই দুই সর্দারজীর ভয়ে টেবিল ছেড়ে উঠতে পারছিলুম না।

—কেন বলুন তো?

—ওদের আমি মশাই ভীষণ ভয় করি। টেবিল থেকে উঠলেই যদি মেরে বসে!

হো হো করে হেসে উঠলুম। বললুম—একা এসেছেন নীলাপুরমে?

পরিতোষবাবু বললেন—হ্যাঁ। আমি মশাই ব্যাচেলার মানুষ। দোকা-টোকা ভালবাসিনে। আপনি?

আমিও তাই।

বাচ্চা ছেলের মতো হি হি হেসে পরিতোষবাবু বললেন—খুব ভাল। খুব ভাল! খবর্দার স্ত্রীলোকের ছায়া মাড়াবেন না। মাড়িয়েছেন না মরেছেন। তা ব্রাদারের নামধাম?

পরিচয় দিতেই লাফিয়ে উঠে বললেন—ওরে বাবা কী আনন্দ, কী আনন্দ। তারপর হাস্যকরভঙ্গীতে শিস দিয়ে বেয়ারাকে ডাকলেন। আমার আপত্তি সত্ত্বেও হুইস্কির অর্ডার দিলেন। বললেন—আপনার মতো সঙ্গী যখন পেয়ে গেছি, আজ মশাই বারসুদ্ধু শুষে খাব।

বললুম—উঠেছেন কোথায় ?

পরিতোষবাবু ছাদ দেখিয়ে বললেন—মাথার ওপরে। এই 'সোয়ানেই'। আপনি ?

—অ্যালবাট্রসে।

খুব ভাল, খুব ভাল।...বলে একটু ঝুঁকে চোখ নাচিয়ে জিগ্যেস করলেন—ওই বুড়ো সায়েবটি কে ? এখানে এসেই আলাপ হয়েছে বুঝি ? আমেরিকান নয় তো ? দেখবেন ব্রাদার—সি. আই. এ. ঘুরঘুর করছে সবখানে। খুব সাবধান। দেশের কোন কথা ফাঁস করবেন না। আপনারা জার্নালিস্ট। আপনারা দেশের সব গুহ্যখবর রাখেন কি না। তাই বলছি।...

বাধা দিয়ে বললুম—না, না। উনি ভারতীয়। শুধু ভারতীয় নয়, বাঙালী।

পরিতোষবাবুর চোখের ঢেলা বেরিয়ে গেল।—এঁ্যা ? উনি বাঙালী ? ওরে বাবা ! কী আনন্দ ! কী আনন্দ ! বেয়ারা, ইধার আও !

এই আনন্দে আবার হুইস্কি এসে গেল। এমন আমুদে লোক খুব কমই দেখেছি। মেজাজ ভাল হয়ে গেল ক্রমশ। বিয়ারের পর দু পেগ হুইস্কি পেটে পড়ার ফলে নেশাও ধরে যাচ্ছিল। এরপর কীভাবে সময় কেটেছে, বলা কঠিন। যখন কর্ণেল ফিরে এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন, তখন আমার চোখে নানারঙের খেলা ভাসছে।...

রাত কীভাবে কেটেছে, মনে নেই। সকালে উঠে দেখি পাশের বেডে কর্ণেল নেই। মাথা ভোঁ ভোঁ করছিল। তাই স্নান করলুম। বেয়ারা এসে ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেল। ব্রেকফাস্ট সেরে সিগারেট ধরিয়ে ব্যালকনিতে গেলুম। সকালের শান্ত সমুদ্র রোদে ঝকমক করছে। সমুদ্রের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে কর্ণেল এসে গেলেন।—হ্যাল্লো ডার্লিং ! উঠে পড়েছ দেখছি !

একটু হেসে বললুম—মদে আমার তেমন নেশা হয় না কর্ণেল!

—তাই বটে! কর্ণেল মৃদু হেসে বললেন।—আশা করি, তাহলে গতরাতে কীসব ঘটেছে তোমার সামনে—সব মনে আছে?

—নিশ্চয় আছে।

—বলে যাও, বৎস।

পরিতোষবাবু আর আমি জমিয়ে খাচ্ছিলুম। তখন আপনি এলেন। তারপর আমরা দুজনে অ্যালবাট্রিসে চলে এলুম।

কর্ণেল আবার হেসে উঠলেন।

—হাসছেন যে?

—হাসছি। কারণ, গতরাতে তোমার প্রচণ্ড নেশা হয়েছিল।

—প্রমাণ?

—প্রমাণ অনেক। তোমাকে নিয়ে রিকশো করে ফিরে আসছি, পথে ঝোপঝাড় আর পাথরের আড়াল থেকে একটা লোক রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়ল। আমাদের সৌভাগ্য, রিকশোটা জোরে যাচ্ছিল তাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।

আঁতকে উঠে বললুম—সর্বনাশ!

কর্ণেল বললেন—যাই হোক, আমি তৈরী ছিলাম। পাল্টা গুলি ছুঁড়ে ওর রিভলবারটা ফেলে দিলুম। হাত চেপে ধরে সে পালালো। তখন রিকশোঅলাকে বললুম তোমাকে পৌঁছে দিতে। আর আমি সেই রিভলবারটা খুঁজে নিয়ে মিঃ ভেঙ্কটেশের কাছে গেলুম। ফরেন্সিক টেস্টে নিশ্চয় ধরা পড়ছে—ওটাই মার্ডার উয়েপন।

—এত কাণ্ড! অথচ কিচ্ছু টের পাই নি!

—পাবে কী ভাবে? পরিতোষবাবু তোমাকে মাতাল করে দিতেই চেয়েছিলেন যে!

—কেন? ওঁর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

—তুমি মদে বেহুঁশ থাকলে ফেরার পথে এই বুড়োকে খতম করাটা খুব সহজ হবে ভেবেছিলেন!

—কর্ণেল, খুলে বলুন।

কর্ণেল পা ছড়িয়ে বসে বললেন—জয়ন্ত, এই কেসটা ইন্সিওরেন্স-ঘটিত।

—বুঝলুম না।

—পুলকেশ মৈত্রের তিনটে ইন্সিওরেন্স করা আছে তিন তিরিশে নব্বুই হাজার টাকার। সে মরলে টাকাটা তৃণা পায়। অতএব পুলকেশ ঠিক করেছিল, সে মরবে। আত্মহত্যার কেসে আজকাল ইন্সিওরেন্স অনেক ঝামেলা করে। কিন্তু কোথাও বেড়াতে গিয়ে খুন হলে ঝামেলা নেই। পুলকেশ ও তৃণা তাই ঠিক করল যে নীলাপুরমে গিয়ে পুলকেশ খুন হবে। হলও। তার মানে স্ত্রী যদি কোন ডেড বডিকে স্বামীর বলে চালায়, অসুবিধে নেই। এবার তৃণাকে বাকিটা করতে হবে। ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে ইন্সিওরেন্সে স্বামীর টাকা ক্লেম করবে। টাকা পেয়ে যাবে। তখন পুলকেশ অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে তৃণার সঙ্গে কোন নতুন এলাকায় পাড়ি জমাবে। আবার সে অন্য নামে ইন্সিওর করবে। আবার খুন হবে। আবার তৃণা টাকা ক্লেম করবে—তখন সেও অবশ্য আর তৃণা নয়, অন্য নাম তাকেও নিতে হয়েছে। এটা হল ওদের তিন নম্বর কেস। এর আগে পুলকেশ আর তৃণা ছিল অরুণ আর মাধবী। তার আগের নাম ছিল পরিমল আর কেতকী। প্রত্যেকবারই তৃণার নির্বোধ প্রেমিকরা খুন হয়।

—বাঃ! বেড়ে বুদ্ধি তো! কিন্তু এবারকার ডেড বডিটা কার?

তৃণার আরেক নির্বোধ প্রেমিক অবনী রায়ের। হাওড়াতে পুলকেশ একটা মারাত্মক ভুল করে। এ ভুল সব বুদ্ধিমান শয়তানের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। না হলে তাদের ধরা যেত না। পুলকেশ তিনটি বার্থ রিজার্ভ করেছিল একই স্লিপে। কিন্তু এখানে পৌঁছে সে অবনীকে নিয়ে যায় দি সোয়ানে। ওখানে অবনীর নামে কিন্তু

রুম বুক করা নেই। আছে পরিতোষ কারফর্মার নামে। পুলকেশ অবনীকে বলেছিল—ওর...এক বন্ধু পরিতোষ কারফর্মার নামে দি সোয়ানে একটা ডাবল রুম বুক করা আছে। পরিতোষ হঠাৎ অন্য কাজে আটকে গেছে। তাই আসছে না। অতএব ওই রুমে সে থাকতে পারে। কোন অসুবিধে হবে না। কিন্তু পরিতোষ তো একজন চাই। তা না হলে দি সোয়ান অবনীকে থাকতে দেবে কেন? অতএব পুলকেশ অবনীকে বলে—সে নিজেই বরং পরিতোষ হয়ে পরিচয় দেবে। রসিদ তো তার কাছেই আছে। এতে ব্যাপারটা দাঁড়াল বেশ মজার। পুলকেশ ধুতি-পাঞ্জাবি পরে খাঁটি বাঙালী বেশে পরিতোষ নামে দি সোয়ানে অবনীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটায়। আবার সী ভিউতে সাহেব সেজে পুলকেশ নামে স্ত্রীর কাছেও থাকে। অবনী নির্বোধ এবং তৃণার প্রেমে অন্ধ না হলে ফাঁদটা টের পেত। দি সোয়ানে তদন্ত করার পর ব্যাপারটা আমরা টের পেয়ে গেলুম।

—পুলকেশকে এ্যারেস্ট করতে পেরেছে তো পুলিশ?

—হুঁউ। গতরাতেই। দি সোয়ানে সেই ঘরটায় ব্যাটা শুয়ে কাতরাচ্ছিল। হাতে জখম। রুমাল বেঁধেও রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না। বেসিনে ডেটলের ছড়াছড়ি। তাকে অবশ্য তক্ষুণি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল।

—সব তো বুঝলুম। কিন্তু ওদের ব্যাকগ্রাউণ্ড এত শিগগির পেলেন কোথায়?

কর্ণেল অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন—তৃণা সব কবুল করেছে।

একটু পরে বললুম—বাইনোকুলার চোখে রেখে খাড়ির ওপর যে লোকটা সী ভিউয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেছিল, সে নিশ্চয় পুলকেশ। কিন্তু লক্ষ্য রাখত কেন?

তৃণার কাছে সংকেত পাবার জন্যে। গ্রিন সিগন্যাল পেলেই সে স্ত্রীর কাছে যেত।......বলে কর্ণেল খিক খিক করে হেসে উঠলেন।

—ভেবেই দেখ জয়ন্ত, তোমাকে বলেছিলুম—আমার খুনের কপাল। সত্যি ডার্লিং, কোথাও বেড়াতে গিয়ে আরামে কাটাব, তার উপায় নেই। দা ইটার্নাল মার্ডারার সবসময় আমাকে অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে।

বুড়ো যথার্থ পাদ্রীর মতো বুকে ক্রস এঁকে করুণ মুখে দেখতে থাকলেন।

হঠাৎ আজব দৃশ্য দেখে ঘর শুদ্ধ্ লোক প্রথমে হতভম্ব হলো, পরে প্রচণ্ড অট্টহাসির ধুম পড়ে গেল। আমি তো হাসতে হাসতে দু'হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে প্রায় মরার মতো দাখিল—ফুসফুস ফেটে যাবে মনে হচ্ছিল। তারপব কর্ণেলের করুণ ও অস্ফুট স্বগতোক্তি শুনলুম—ও জেসাস!

মুখ তুলে টেবিলের ওপর দুহাত তোলা, অর্থাৎ হ্যাণ্ডস আপ ভঙ্গিতে কর্ণেল বুড়োকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম এবং ফের দম-ফাটানো হাসির চাপ এল। মেঝেয় ছোট মেয়ে নিনা তখনও খেলনাব পিস্তলটা তাক করে আছে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের বোধ থেকে জানলুম—কর্ণেলের মুখে এবং ওই ভঙ্গীতে যা দেখেছি তা যেন একটি ছোট মেয়েরই সঙ্গে কৌতুক নয়। তা যেন ভান নয় মোটেও। যেন কোন হিংস্র আততায়ী সত্যিসত্যি একটা প্রকৃত মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র তাঁর দিকে তাক করেছে।

একি আমার নিছক দেখার ভুল? কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার স্বভাবত সিরিয়াস টাইপের মানুষ। তাঁর মানমর্যাদাও সামান্য নয়। বিশেষত প্রতাপপুর অভ্রখনির মালিকের এই বাড়িতে তিনি এখন একজন বরেণ্য অতিথি।

বিজয়েন্দু রায়ের সাত বছরের মেয়ে নিনা টয় পিস্তল হাতে ঘরে ঢুকেই তাঁকে তাক করে যেই বলেছে—হ্যাণ্ডস আপ, অমনি কিনা ওই রাশভারী ঘুঘু কর্ণেল আচমকা একলাফে কোণায় উঁচু টেবিলে উঠে দাঁড়ালেন—শুধু তাই নয় দুহাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন—নো নো নো!

মিসেস রায়! মিসেস রায়! ঈশ্বরের দোহাই, ওটা কেড়ে নিন।

পরক্ষণে চন্দ্রকণা মেয়ের হাতের টয় পিস্তলটা কেড়ে নিয়েছেন—বাবা! খুব ভয় পেয়েছেন কর্ণেলদাদু। দেখছ না—হ্যাণ্ডস আপ করেছেন? ব্যস! এবার তুমি অন্য খেলা খেল গে কেমন?

ঘরে তখনও হাসির আবহাওয়া। কর্ণেলকে নামতে দেখলুম! কিন্তু আশ্চর্য, মুখটা গম্ভীর। সোফার আগের জায়গায় বসে কাঁচুমাচু হয়ে বললেন—ইয়ে আপনারা ক্ষমা করবেন আমায়। জাস্ট এ ফান। কিন্তু রিয়েলি—এত হঠাৎ ও অমনভাবে ঢুকল যে…মাই গড! হোয়াট এ ফান? ফের সবাই হাসল। নিনা ওর মায়ের হাত থেকে পিস্তলটা নেবার চেষ্টা করছে। আমি বললুম—দিয়ে দিন না! তখন চন্দ্রকণা সেটা ওকে ফেরত দিলেন। মুখে প্রচুর হাসি।

নিনা পিস্তলটা নিয়ে ফের কর্ণেলের দিকে তাক করতেই কর্ণেল এবার সব গাম্ভীর্য এবং কাঁচুমাচু ভাব ভেঙে হো হো করে হেসে ফেললেন এবং ডাকলেন—নিনি! চলে এস! দেখি তোমার পিস্তল! হুঁ—দেখি দেখি!

খুব ভয় পেয়েছিলুম। দারুণ ভয়!—বলে কর্ণেল ওর পিস্তলটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন।—বাঃ! চমৎকার পিস্তল কিন্তু! আজকাল আমাদের খেলনা তৈরীতে খুব উন্নতি করেছে। ইয়ে মিসেস রায়,এটা—এটা বুঝি সম্প্রতি কেনা হয়েছে?

চন্দ্রকণা জবাব দিলেন—হ্যাঁ। পরশু উনি কলকাতা থেকে এনে দিয়েছেন। নিনা কদিন থেকে টয় পিস্তলের বায়না ধরেছিল, আজকাল বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ওয়েস্টার্ন ফিল্মের কায়দায় গানডুয়েল খেলতে ভালবাসে। নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন কর্ণেল?

কর্ণেল বললেন—তাই বটে! তবে আর একটা ব্যাপার নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন মিঃ রায়? আজকালকার খেলনা কিন্তু মোটেও খেলনার মতো দেখায় না। অবিকল আসল জিনিসের ক্ষুদে সংস্করণ। তাই না? যেমন এই টয় পিস্তলটাই দেখুন। পরীক্ষা করার

আগে কার সাধ্য এটা খেলনা ভাবতে পারে? তাছাড়া ওজনও দেখছি প্রকৃত পিস্তলের মতো।

এবার সকৌতুকে বললুম—তাই বুঝি আপনি প্রাণভরে টেবিলে চড়েছিলেন? কিন্তু আপনার কিলার নিনাও যে একটা বাচ্চা মেয়ে সে কথাটা নিশ্চয় মাথায় ঢোকে নি?

কর্ণেল একটু হেসে রহস্যময় ভঙ্গীতে মাথা দোলালেন। বিজয়েন্দু হাসতে হাসতে বললেন যদি সিরিয়াসলি ধরেন তাহলে বলব কর্ণেলের গোয়েন্দা মানসিকতারই এটা একটা প্রকাশ। অনবরত হত্যাকারীর মুখোস ফাঁস করা যার নেশা ও পেশা তার মনে এমন আতঙ্ক থাকা স্বাভাবিক।

একটু পরে সুদৃশ্য ট্রে এবং পট-পেয়ালায় কফি তার সঙ্গে কিছু স্ন্যাকস এল। এখন সকাল সাতটা। যে ঘরে আমরা বসে আছি তা পাহাড়ের গায়ে একটা বাংলোবাড়ি। দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত সুন্দর উপত্যকা, পূবে ছোটখাটো পাহাড় এবং উপত্যকা পেরিয়ে একটা নদী, পূর্বের পাহাড় ঘেঁসে দক্ষিণে চলে গেছে। সময়টা সেপ্টেম্বর। তাই প্রাকৃতিক দৃশ্য তুলনাহীন।

খনি রয়েছে এই পাহাড়ের উত্তর দিকের অন্য একটা উপত্যকায়। এখান থেকে দুমাইল দূরে একটা সুন্দর পীচের রাস্তা বাংলোর পশ্চিম গেট থেকে শুরু হয়ে উত্তর ঘুরে উৎরায়ে নেমেছে এবং বড় সরকারী সড়কে মিশেছে। ওই সড়ক ধরে এগোলে খনিতে পৌঁছানো যায়।

আমরা, দৈনিক সত্যসেবকের রিপোর্টার শ্রীমান জয়ন্ত চৌধুরী এবং তার বৃদ্ধ বন্ধু গোয়েন্দা ও প্রকৃতিবিদ কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার দৈবাৎ এসে পড়েছি এখানে। দক্ষিণ-পশ্চিমের উপত্যকার জঙ্গলে কর্ণেল কিছু বিরল প্রজাতির প্রজাপতি সংগ্রহ করবেন এবং আমি তাকে নিছক সঙ্গ দেব। ফরেস্ট বাংলোয় ওঠার কথা ছিল। কিন্তু পথে হঠাৎ বিজয়েন্দুর সঙ্গে দেখা এবং কর্ণেল তার পরিচিত—অতএব কিছুতেই জঙ্গলে কাটাতে দেবেন না। তার অতিথি হয়ে গতকাল

সন্ধ্যায় এখানে আসতে হল। এখন এ ঘরে রায়দম্পতি ও তাঁদের মেয়ে নীনা ছাড়া আরও তিনজন ভদ্রলোক রয়েছেন। আলাপ হয়েছে পরস্পর। সতীনাথ চাকলাদার কলকাতা থেকে এসেছেন নিছক শিকারে, তিনি নামকরা শিকারী। আমাদের যে ফরেস্ট বাংলোয় থাকার কথা তিনি সেখানেই একটা ঘরে আছেন। এসেছেন গত পরশু। বিজয়েন্দু ওঁর বন্ধু। নরেন্দ্র সিংহ রায় পাঁচ মাইল দূরের প্রতাপগড় বাজারের একজন ব্যবসায়ী। আর আছেন শ্যামল মুখার্জি,—বিজয়েন্দুর খনির ম্যানেজার।

বিজয়েন্দুর বয়স চল্লিশ-চুয়াল্লিশ। শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ গড়নের মানুষ, কেমন যেন বন্য চেহারা। গেঁয়ার গোবিন্দ বলে মনে হয়েছে। শিকারী সতীনাথ কিন্তু উল্টো চেহারার ও স্বভাবের। ওর হাসিটি এত চমৎকার যে, ভাবাই যায় না এই মানুষ হিংস্র বন্য জন্তুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তেও ওস্তাদ। রোগা, ঢ্যাঙা, একটু কুঁজো—বয়সে বিজয়েন্দুর কাছাকাছি। নরেন্দ্র বাবু হোঁদলকুতকুতে গড়নের সুখী সুখী চেহারার মানুষ—বয়স অনুমান পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ। সবসময় পান খান। কথা খুব কম বলেন। বেশি হাসেন। শ্যামল বাবু আমার বয়সী, অর্থাৎ বত্রিশ। সফিস্টিকেটেড বলা যায়, একটু গম্ভীর। তীক্ষ্ণ চোখজোড়ায় সর্বজ্ঞের হাবভাব। চন্দ্রকণা কিন্তু স্ত্রী হিসেবে বিজয়েন্দুর বে-মানানই বলব। অসাধারণ সুন্দরী তো বটেই—বয়সেও মনে হল অন্তত দশবারো বছরের ছোট, স্বামীর চেয়ে।

কফি খেতে খেতে এবার শিকারের গল্প শুরু হল। আমারও শিকারে একটু আধটু নেশা ও অভিজ্ঞতা আছে। সঙ্গে রাইফেলও এনেছি একথা শুনে সতীনাথ আমার দিকে ঝুঁকলেন। বেগতিক দেখে কর্ণেল বলে উঠলেন—তবে সাবধান মিঃ চাকলাদার, জয়ন্ত মাঝেমাঝে ভুলে যায় যে ওর হাতে রাইফেল আছে। ও খাঁটি রিপোর্টারের মতো বধ্য জন্তুর দিকে তাকায় যেন সত্যসেবকে কীভাবে ফাস্ট লাইনটা শুরু করবে। সুতরাং সাবধান।

সবাই হাসলেন। আমি বুঝলুম বুড়ো আমাকে নিয়ে কার্টবেন এই সন্দেহে ভুগছেন। তাই ওঁকে আশ্বস্ত করে বললুম—'আমি এবার শিকার-টিকারে বেরুচ্ছিনে। এখানে বসে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেই সময় কাটাব।

সতীনাথ বললেন—কর্ণেলও তো শুনেছি পাকা শিকারী! সুতরাং বেরুতে হলে তিন জনেই বেরুব। কী বলেন কর্ণেল!

এইসব গল্পসল্প হতে হতে আটটা বেজে গেল। চন্দ্রকণা ততক্ষণে মেয়েকে নিয়ে অন্য ঘরে গেলেন। নিনা খুব চঞ্চল মেয়ে।

তারপর সতীনাথ আমাদের দুজনকে ফরেস্ট-বাংলোয় আমন্ত্রণ জানিয়ে চলে গেলেন। একটু পরে নরেন্দ্র বেরিয়ে গেলেন। তার কিছু পরে শ্যামলবাবু ও বিজয়েন্দু কাজকর্ম নিয়ে পাশের ঘরে কথা বলতে চলে গেলেন। ঘরে রইলুম কর্ণেল ও আমি।

কর্ণেলের মুখটা আবার গম্ভীর দেখাচ্ছিল। বললুম—হ্যালো ওল্ড ম্যান! ব্যাপারটা কিছু বলুন তো!

কর্ণেল তাকালেন—কিছু কি বলছ, ডার্লিং?

হুঁ, বুড়ো কি যেন ভাবছিলেন। বললুম—এনিথিং সিরিয়াস?

বুড়ো ঘাড় নাড়লেন। তারপর ঠোঁট ফাঁক করলেন—কিন্তু কিছু বললেন না।

—মনে হচ্ছে একটা কিছু চক্রান্ত করছেন? কর্ণেল হঠাৎ আমার হাতে হাত রেখে চাপা গলায় বললেন—জয়ন্ত! ওই টয় পিস্তলটা—

উনি থামতেই চমকে উঠে বললুম—কেন! আপনার কি মনে হল ওটা টয় পিস্তল না।

—হ্যাঁ, ডার্লিং। ওটা একটা খেলনার পিস্তলই বটে!

—তাহলে?

—কিন্তু—আশ্চর্য, জয়ন্ত, আশ্চর্য!

এবার বিরক্ত হলুম। সব তাতেই ওঁর যেমন নাক গলানো অভ্যাস তেমনি যেন আজকাল সব কিছুতেই রহস্য টের পাবার

'ম্যাজিক' দাঁড়িয়েছে। বললুম—একটা টয় পিস্তলে কী আশ্চ থাকতে পারে বুঝলুম না! ছেড়ে দিন!

কর্নেল আমার বিরক্তি অগ্রাহ্য করে ফের বললেন—ওটা অবিকল আসল পিস্তলের মতো দেখতে। এমন কি ওজনও একই। কেন জয়ন্ত, কেন?

নির্ঘাৎ বুড়োর এবার ভীমরতি ধরেছে। অগত্যা উঠে দাঁড়িয়ে বললুম—আপনার কিঞ্চিৎ খোলা বাতাস সেবন করা দরকার। টুপি খুলে টাক বিকশিত করে, হে প্রাজ্ঞ ঘুঘুমশায়, নদীর ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন। ঘিলুর ধুলোময়লা সাফ হয়ে যাবে। আসুন।

কর্নেলও উঠে দাঁড়ালেন, তখুনি সায় দিয়ে বললেন—ঠিকই বলেছ ডার্লিং! এর চেয়ে আপাতত আরামদায়ক কিছু নেই। ওঃ, এই ঘরে যেন আমার দম আটকে আসছে।

সেই যে বেরুলুম দুজনে, পুরো দুপুর কেটে গেল জঙ্গলে—জঙ্গলে। কর্নেলকে স্বাভাবিক দেখে আশ্বস্ত হয়েছিলুম। কাঁধে কিটব্যাগ নিয়েছিলেন। তার মধ্যে প্রজাপতি ধরা জাল আর ভাঁজকরা খাঁচাও ছিল। আড়াইটে অব্দি সাতটা প্রজাপতি ধরলেন উনি। পাখির পিছনেও বাইনোকুলার চোখে নিয়ে ছোটাছুটি করলেন। আমার অবস্থা তখন শোচনীয়। অবশেষে কর্নেলের দৃষ্টি ঘড়ির কাঁটার দিকে আনা গেল এবং দুজনে গলদঘর্ম হয়ে ফেরার পথে পা বাড়ালুম।

কিন্তু নদীর ধারে এসে হঠাৎ কর্নেল বললেন—জয়ন্ত, মনে হচ্ছে আমরা ফরেস্ট-বাংলোর কাছে এসে পড়েছি। একবার অন্তত মিঃ চাকলাদারের সঙ্গে দেখা করা উচিত। কী বলো?

বিরক্ত হয়ে বললুম—লাঞ্চের সময় চলে গেল যে! তাছাড়া উনি এখানে আছেন, না জঙ্গলে ঘুরছেন—ঠিক নেই!

কর্নেল আমার হাত ধরে সস্নেহে টানলেন।—ডার্লিং, এটা ভদ্রতা! জঙ্গলে আছি—কিন্তু আমরা মানুষ এবং জেন্টলমেন।

অতএব —খুকখুক করে হেসে উনি যেন বীরবিক্রমে হাঁটা শুরু করলেন। একটু পরেই টের পেলুম, এ যাওয়া স্বাভাবিক গতিতে নয়। তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো ঝোপঝাড় ভেঙে আগাছা মাড়িয়ে যেন আশ্রয়ের খোঁজে ছুটে যাওয়া। কয়েকবার ওঁর টুপি কাঁটায় আটকে গেল। দ্রুত ছাড়িয়ে নিলেন। আমিও প্রায় ক্ষতবিক্ষত হলুম। তারপর হঠাৎ কর্ণেল আমাকে টেনে ধরে বসিয়ে দিলেন এবং নিজেও বসলেন। ঝোপের আড়াল ছিল। তার ওধারে ফরেস্টবাংলোটা দেখা যাচ্ছিল। নদীর এপারেই একটা টিলার গায়ে রয়েছে সেটা। তারপর দেখলুম, কর্ণেল বাইনোকুলার দিয়ে বাংলোটা দেখছেন। আমি অবাক এবং অস্থির।

একটু পরে ঘুরে কর্ণেল চাপা গলায় বললেন—একমিনিট, জয়ন্ত। তুমি এখানে অপেক্ষা করো, আমি এখুনি আসছি। সাবধানে, যেভাবে বসে আছ, তাই থাকবে। নড়ো না।

কোন প্রশ্নের সুযোগ না দিয়ে উনি গুঁড়ি মেরে এগোলেন। ওঁর ভঙ্গী দেখে মনে হল, একটা ক্ষুধার্ত সিংহ যেন চুপিসারে তার শিকারের দিকে এগিয়ে চলেছে। একটু পরেই ওঁকে গাছপালা ও ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হতে দেখলুম। এই অদ্ভুত কাণ্ডের মাথামুণ্ডু না খুঁজে পেয়ে অগত্যা হাল ছেড়ে দিতে হল। ঝোপের ফাঁকে দূরের ওই বাংলোর দিকে চোখ রইল আমার।

কিন্তু বাংলো যেমন নির্জন ছিল তেমনিই রয়েছে। জনপ্রাণীটি নেই। পনের মিনিট কেটে গেল। তারপর সামনের দিকে শুকনো পাতা মচমচ করে উঠল। শব্দটা এগিয়ে আসতে থাকল। রাইফেলটা সঙ্গে নিয়ে বেরোই নি। তাই অসহায় হয়ে আশা করতে থাকলুম যে, এই শব্দ যেন কর্ণেলেরই হয়। শেষঅব্দি আশা মিটল। আন্দাজ পঞ্চাশ গজ দূর থেকে কর্ণেলের টুপি চোখে পড়ল। ওঁর মুখে রহস্যময় হাসি। কাছে এসে ফিসফিস করে বললেন যে পথে এসেছি সেই পথে এই ভাবেই ফিরতে হবে, জয়ন্ত। সাবধান।

অতএব ফের সেইসব কাঁটার খোঁচা খেতে খেতে আগের জায়গায় পৌঁছান হল এবং এবার উনি চড়া গলায় জঙ্গলের সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে করতে সুপথে পা বাড়ালেন।

বিজয়েন্দুর বাংলোর কাছে পৌঁছে এতক্ষণে বললুম—এসবের মানে কী?

কর্ণেল আমার হাত টেনে নিয়ে বললেন—অধৈর্য হয়ো না বৎস। ঠিক মতো সব কিছু চললে তুমি এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারবে। জয়ন্ত, এটা আমার দূরদৃষ্ট বলতে পারো। যেখানে যাই, এক মারাত্মক আততায়ী আমার সঙ্গে পাল্লা কষতে এগিয়ে আসে। না-না-ডার্লিং। তুমি ভয় পেয়ো না। আশা করি, খুব বেশি কিছু ঘটবে না।

অস্থিরতা চেপে রাখতে হল। আর তখন খিদেয় নাড়িভুঁড়ি জ্বলছে।

সেদিন সন্ধ্যায় বিজয়েন্দুর সেই ঘরে আবার আড্ডা চলেছে। তবে এ-বেলা সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক, অর্থাৎ নরেন্দ্র সিংহ রায় আসেন নি। শিকারী বা ম্যানেজারও না। আমি, কর্ণেল ও রায়দম্পতি গল্প করছি। গল্প করার সময় কর্ণেলের অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করছিলুম। মাঝেমাঝে ঘড়ি দেখছেন আড়চোখে। কে যেন আসবে, প্রতীক্ষা করছেন। কে সে?

পাশের ঘরে নিনা ইংরেজি ছড়া মুখস্থ করছে, শোনা যাচ্ছিল। মাঝেমাঝে আবার কথাও বলছিল। বাইরে তখন ফুটফুটে শরৎকালীন জ্যোৎস্না।

কর্ণেলের চঞ্চলতা এবার বিজয়েন্দুর চোখে পড়ল। বললেন—কর্ণেলের কি শরীর খারাপ করছে?

কর্ণেল ব্যস্তভাবে বললেন—ও নো নো! আমি—ইয়ে মিঃ রায়, ভাবছি যে আজ রাতটা বরং ফরেস্ট বাংলোয় গিয়ে কাটাব। ভারি চমৎকার জ্যোৎস্না ফুটেছে। তাছাড়া আজ দুপুরে জায়গাটা দেখে

এসেছি—অপূর্ব। আপনি যদি কিছু না মনে করেন—

বিজয়েন্দু বললেন—না, না। মনে করার কি আছে?

চন্দ্রকণা বললেন—কিন্তু এক শর্তে। এখানে ডিনার না খেয়ে নয়।

কর্ণেল বেজার মুখে বললেন—প্লিজ মিসেস রায়। আপনার রাঁধুনীকে কিন্তু আগেভাগেই জানিয়ে দিয়েছি। সে আপনাকে কিছু বলে নি?

চন্দ্রকণা কুজমুখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—কই না তো। তারপর ভেতরে চলে গেলেন। হয়তো রাঁধুনীকে ধমক দিতেই গেলেন।

বিজয়েন্দু একটু হেসে বললেন—তাহলে যা ভেবেছি। শরীর খারাপ। মুশকিল কী জানেন, এ জায়গাটা একটা বিউটি স্পষ্ট। কিন্তু জলবায়ুটা তেমন ভাল নয়। আমারও মাঝেমাঝে পেটের অসুখ হয়।

কর্ণেল এ সময় আমাকে গোপনে একটু খুঁচিয়ে দিলেন। তারপর বললেন—হ্যাঁ। জয়ন্তেরও সেই অবস্থা। তাই ওকেও বলেছি, রাত্তিরটা আমার সঙ্গে উপোস করতে।

আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলুম। পাশের ঘরে চন্দ্রকণা শুনলুম মেয়েকে বকাবকি করছেন—এখন খেলে না। ছিঃ। এখন কি খেলার সময়? নিনা অনুযোগ করছে, শোনা গেল।

বাইরে কার সাড়া পাওয়া গেল—রায়, আসতে পারি? বিজয়েন্দু উঠে গেলেন। তারপর দেখি, সতীনাথ ঢুকছেন ওঁর সঙ্গে। কর্ণেলের মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটল। বললেন- আসুন, আসুন মিঃ চাকলাদার। আপনি না থাকায় মোটেও আড্ডা জমছিল না। তারপর বলুন, আজ কী শিকার টিকার করলেন।

সতীনাথ হাসিমুখে বসে বললেন—একটা সাপ মেরেছি। হামড্রায়াড। অর্থাৎ শঙ্খচূড়।

এরপর ফের গল্পের আবহাওয়া জমজমাট হয়ে উঠল। চন্দ্রকণা ফিরলে সতীনাথ ফের গোড়া থেকে সাপ মারার ঘটনা শুরু করলেন।

তারপর এক ঝাঁকে হঠাৎ নিনা সকালের মতো সেই টয় পিস্তল হাতে ঢুকে পড়ল। , বিজয়েন্দু হেসে বললেন—নিনি, এবার আর কর্ণেল-দাদুকে নয়—তোমার শিকারীকাকুকে এ্যাটাক করো! জোরে ট্রিগার টিপবে কেমন? তাহলেই কাকু ব্যস!

অমনি নিনা পিস্তল তাক করল সতীনাথের দিকে। কিন্তু আশ্চর্য, সতীনাথ, ঠিক সকালে কর্ণেল যা করেছিলেন, তার চেয়েও হাস্যকর কাণ্ড করে বসলেন। এক লাফে তিনি প্রায় চোখের পলকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর বাইরে ওঁর প্রচণ্ড গর্জন শোনা গেল—বিশ্বাসঘাতক। ব্রুট। এর শোধ একদিন নেবই নেব।

কর্ণেল চেঁচিয়ে উঠলেন—মিঃ চাকলাদার। ফিরে আসুন। কোন ভয় নেই।

কিন্তু চেঁচিয়ে ওঠার মধ্যেই উনি একলাফে নিনার পিস্তলটাও ধরে ফেলেছেন। নিনা কেঁদে উঠেছে। চন্দ্রকণা স্তম্ভিত। বিজয়েন্দু হাঁ করে আছেন। সতীনাথের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ভদ্রলোক কি সত্যি চলে গেলেন?

নিনার হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে কর্ণেল হাসতে হাসতে জানলা দিয়ে তাক করলেন এবং আমাদের আরও হতবুদ্ধি ও আতঙ্কিত করে ট্রিগার টিপতেই সত্যিকার পিস্তলের আওয়াজ রাতের স্তব্ধতা খানখান করে দিল। আমার বুক টিপটিপ করতে থাকল।

বিজয়েন্দু লাফিয়ে উঠে বললেন—সর্বনাশ! নিনা করেছে কী!

কর্ণেল ভৎর্সনার ভঙ্গীতে বললেন—আপনার পিস্তলের সঙ্গে নিনার খেলনা পিস্তল বদল হয়ে গেছে, মিঃ রায়। আপনি এবার থেকে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে সতর্ক হবেন।

বিজয়েন্দু বললেন—আমি খুব দুঃখিত, কর্ণেল। আমার পিস্তলটা ড্রয়ারে থাকে। কিন্তু মনে হচ্ছে, চাবি দিতে ভুলে গিয়েছিলুম। কী সর্বনাশ ঘটে যেত এক্ষুণি! কর্ণেল পিস্তলটা ওঁকে দিয়ে বললেন—এবার চলি। জয়ন্ত তুমি গুছিয়ে নাও। আর মিঃ রায়, মানুষকে

ক্ষমা করতে শিখুন।

বিজয়েন্দু কোন কথা বললেন না। পিস্তলটা হাতে নিয়ে গম্ভীর মুখে বসে থাকলেন। নিজেদের ঘরে গিয়ে গোছগাছ করছি, সেই সময় চন্দ্রকণার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুনলুম। কর্ণেল ফিসফিস করে বললেন, জয়ন্ত, ওই জটিল দাম্পত্য সমস্যা মেটাবার ক্ষমতা আমাদের নেই। অতএব দ্রুত বেরিয়ে পড়া যাক।

রাস্তায় গিয়ে বললুম—কিন্তু ব্যাপারটা কী? কর্ণেল বললেন—এখনও টের পাচ্ছ না? সতীনাথ চন্দ্রকণার পুরনো প্রেমিক। বিজয়েন্দু এবার ঠিক করেছিলেন সতীনাথ এলেই মেয়ের হাত দিয়ে ওঁকে খুন করাবেন। খুব সরল পন্থা। দৈবাৎ বাচ্চা মেয়ে তাঁর অটোমেটিক পিস্তলের সঙ্গে নিজের টয় পিস্তল বদল করে নিয়েছে। অতএব হত্যাকাণ্ডের দায়টা আইনের ফাঁকে উড়ে যাবে। আজ সকালে আমি যে আচরণ করেছিলুম, তা বিজয়েন্দুকেই সতর্ক করে দিতে। নির্বোধ বিজয়েন্দু তা আঁচ করেন নি। আর, আজ দুপুরে আমার অত সতর্কতার কারণ আর কিছু নয়—বিজয়েন্দু খনিতে যাওয়ার পর চন্দ্রকণা প্রেমিকের কাছে আসবেন, এই ধারণা ছিল। তাই পাছে প্রেমিকদ্বয়ের চোখে পড়ি, একটু সতর্ক হয়েছিলুম।

বললুম—এবং গোপনে গিয়ে সবটা প্রত্যক্ষও করে এসেছিলেন।

কর্ণেল বললেন—হ্যাঁ। কারণ আজ সকালেই চন্দ্রকণা ও সতীনাথের হাবভাবে আমার সন্দেহ জেগেছিল। যাকগে, এখন চলো বেচারা সতীনাথকে সান্ত্বনা ও উপদেশ দেওয়া যাক।

আচমকা অদ্ভুত শব্দ করতে করতে আমাদের গাড়িটা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল। গেল তো গেলই। অনেক চেষ্টা করেও তার গোঁ ছাড়াতে পারলুম না। ঘড়ি দেখলুম। পাঁচটা কুড়ি। গ্রীষ্মের বিকেল। এক পাশে ধূ ধূ ফাঁকা মাঠ, অন্য পাশে ছোট বড় গাছের জঙ্গল। সামনে সাঁকো। একটা ছোট নদী দেখা যাচ্ছিল। তার উপরে পাঁচিলঘেরা কারখানার মতো বাড়ি। কারখানা নিশ্চয় নয়। হয়ত ফার্ম হাউস। শুকনো মুখে সঙ্গীটির দিকে তাকালুম। উনি অভ্যাস মতো চোখে বাইনোকুলার রেখে জঙ্গলের দিকে কিছু দেখছেন। পাখি ছাড়া আর কি? ওঁর ওই এক বাতিক।

বললুম—মাই ডিয়ার ওলড্ ম্যান, দয়া করে একবার এদিকে নজর দেবেন কি?

ওঁর যেন কানেই ঢুকল না কথা। এমন কি গাড়িটাও যে চরম-ভাবে বিগড়ে গেছে, তাও যেন টের পাচ্ছেন না। বাইনোকুলারে চোখ রেখে পিঠ সোজা করে বসেছেন। নিশ্চয় দুর্লভ কিছু নজরে পড়েছে।

—এই যে স্যার, শুনছেন? আমরা থেমে গেছি।

কাকে কী বলছি! বুড়ো মানুষ। নির্ঘাৎ বাহাত্তুরে ধরেছে। আপশোস হতে লাগল, বারবার জেনেশুনে একই ভুল করে আসছি। ওর মতো পাগল-ছাগল মানুষের পাল্লায় পড়ে কতবার কতভাবে বিপদে পড়েছি, সংখ্যা নেই। অথচ বড় যাদুকর এই কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার—একবার মিঠে গলায় ডার্লিং ডেকে ফেললেই আমি বশ হয়ে যাই।

আসছি ঝুমকা থেকে রামপুরহাটের দিকে। গাড়িটা ল্যাণ্ডমাস্টার। যাবার সময় একটুও গোলমাল করে নি। কিন্তু ফেরার পথে সেই

দুপুর থেকে বার তিনেক ঝামেলা বাধিয়েছে। এর ফলে দেড় ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়েছে। এতক্ষণ রামপুরহাটে সরকারী বাংলোয় পৌঁছে বিশ্রাম নেবার কথা। আগামীকাল সকালে কলকাতা রওনা হতেই হবে। খবরের কাগজে রিপোর্টারের চাকরি করি। আজ রাতেই রামপুরহাট থেকে টেলিগ্রামে একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পাঠানোর কথা আছে। দুমকায় কয়েকলক্ষ আদিবাসীর এক রাজনৈতিক সম্মেলন হয়ে গেল। খুব উত্তেজনা ছড়াচ্ছে আদিবাসী আন্দোলন। পৃথক রাজ্যের দাবি উঠেছে। এখানে ওখানে প্রায়ই কিছু সংঘর্ষ ঘটছে।

গিয়েছিলুম সম্মেলনের কভারেজে। অথচ আমার বরাত। গিয়েই দেখি কোত্থেকে বেমক্কা সেখানে উপস্থিত রয়েছেন প্রখ্যাত বুড়ো ঘুঘু এই কর্ণেল। পুলিশ সুপার ওর স্নেহভাজন বন্ধু। সেই সুবাদে আতিথ্য নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে দুর্লভ জাতের পাখী আর পোকামাকড় দেখে বেড়িয়েছেন। আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরেছিলেন। হ্যালো সুইটহার্ট! তোমার সঙ্গেই কলকাতা ফেরা যাক তাহলে!

ওকে দেখেই ভেবেছিলুম, ব্যস, এই হল আর কী! যেখানে এই বুড়ো ঘুঘু সেখানেই তো খুনখারাপি—সুতরাং গোয়েন্দাগিরি! এবার চাকরিটা আর বাঁচানো যাবে না। কিন্তু ভাগ্য ভাল, খুনখারাপির গোয়েন্দাগিরিতে ওর আবির্ভাব হয় নি। এসেছেন নিছক ভ্রমণে। যাই হোক, একা বোকার মতো চুপচাপ কলকাতা ফেরার চেয়ে একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। বিশেষ করে, কর্ণেলের মতো সঙ্গী যে হয় না—তা অস্বীকার করব না।

পথে তিনবার গাড়ি বিগড়ানোতে মনে একটা অস্বস্তি জাগছিল। কেন, তা বলা কঠিন। এই চতুর্থবার যখন বিগড়লো, এবং সন্ধ্যার মুখোমুখি—তখন সেই অস্বস্তি বেড়ে গেল। মনে হল, এই বুড়োর ভাগ্যদেবতা যিনি—তাঁরই কারচুপিতে আমি বারবার যেমন জড়িয়ে

যাই,—এবারও যাবো। ভাবলুম, ওকে এড়িয়ে একা ফেরাই ভাল ছিল। তাহলে নিশ্চয় গাড়ি এমন বদমাইসি করত না।

আফশোসে বিরক্তিতে এসব ভাবছি, হঠাৎ দেখি উনি উঠলেন। চোখে বাইনোকুলার তেমনি লাগানো—দরজা খুলে নামলেন। এবং কোন কথা না বলে দিব্যি হনহন করে ব্রিজের দিকে এগোলেন। ক্ষেপে গিয়ে ডাকতে ঠোট ফাঁক করেই বুজিয়ে দিলুম। পাগল-ছাগল লোকটার কাণ্ড দেখতে থাকলুম! নিশির ডাকে যেমন নাকি লোকে বেরিয়ে পড়ে, তেমনি সম্মোহিতের মতো নাক বরাবর জঙ্গল ঠেলে চলেছেন। কোন দুর্লভ জাতের পাখি দেখেছেন নাকি!

কর্ণেল অদৃশ্য হলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নামলুম। যথারীতি এঞ্জিনের ঢাকনা তুলে গণ্ডগোলের কারণ খুঁজতে ব্যস্ত হলুম।

এক ঘণ্টারও বেশি নানান চেষ্টাতেও কিছু হল না। রাস্তায় কোন লোক নেই যে ঠেলতে বলব। অগত্যা এগিয়ে গেলুম নদীর ওপারে সেই খামার বাড়িটার দিকে। ওখানে গেলে নিশ্চয় সাহায্য পাব।

কর্ণেলের কথা মন থেকে মুছে ব্রিজ পেরিয়ে গেলুম। দুশো গজ দূরে ফার্মের গেটটা দেখা গেল। সাইনবোর্ডে লেখা আছে ঃ ভূমিলক্ষ্মী ফার্ম হাউস (প্রাইভেট) লিমিটেড। কেন্দুহাটি, বীরভূম। কাছাকাছি কোন গ্রাম দেখা গেল না। ফার্মটা একেবারে একলা হয়ে আছে। পূবে-দক্ষিণে অনেকটা জমিতে বেড়া দিয়ে চাষবাস করা হচ্ছে। বাড়ির এলাকাও বিশাল। পশ্চিমে নদী এবং জঙ্গল। উত্তরে রাস্তা, রাস্তার উত্তরে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ।

গেটে কোন লোক নেই। কিন্তু খোলা আছে। ভিতরে সব্জীখেত আর ফুলবাগিচা। মধ্যে চমৎকার একফালি রাস্তা। ভেতরে ঢুকে পড়লুম। সামনে একতলা কয়েকটা ঘর, বাঁদিকে গুদামঘর ও টিনের শেড। অনেক কৃষিযন্ত্র দেখা গেল। রীতিমতো মেকানাইজড কৃষির ব্যবস্থা আছে তাহলে। ডান দিকে তাকাতেই এক বিচিত্র

দৃশ্য চোখে পড়ল।

পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং মহামান্য কর্ণেল হিমাদ্রি সরকার। এবং টুপি খুলে নীচের কোন কিছুর প্রতি যেন হুকুম জারি করছেন। ভীষণ নাড়ছেন টুপিটা। মাঝে মাঝে নাচের ভঙ্গীতেও কী সব করছেন। বাতাস বইছে জোর। উনি কিছু বলছেন—কিছু শোনা যাচ্ছে না স্পষ্ট।

ব্যাপারটা দেখে তো আমি হতভম্ব। সব রাগ বিরক্তি পলকে ঘুচে গিয়ে বেদম হাসি পেল। হো হো করে হেসে উঠলুম। চেঁচিয়ে বললুম—হ্যালো ওল্ড ফেলার! সার্কাস দেখাচ্ছেন কাকে?

এবার উনি আমাকে দেখতে পেলেন। পেয়েই টুপিসুদ্ধ হাত নেড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—গো ব্যাক, গো ব্যাক জয়ন্ত! সাবধান!

হাসতে হাসতে ওর দিকে এগোলুম।—ব্রিলিয়ান্ট কর্ণেল! আপনি সার্কাসেও খেলোয়াড় ছিলেন, বলেন নি তো এতদিন!

কর্ণেল আবার চেঁচিয়ে উঠলেন—জয়ন্ত! এগিয়ো না - এগিয়ো না?

আমার সামনে কিছু সব্জীঝাড় ও মাচান। তার ওধারে সেই পাঁচিল। ওর কথা গ্রাহ্য না করে এগোলুম। তারপর কর্ণেলের দিকে তাকিয়ে হাততালি দিয়ে হাসতে হাসতে বললুম—সাবাস কর্ণেল! জোর জমেছে।

কথা শেষ হতে না হতে আচমকা সামনে মাচানের ওপাশে একটা জান্তব গর্জন শোনা গেল—গাঁক্ গাঁ—আঁ—ক্! তারপরই দেখি একটা প্রকাণ্ড সাদা ষাঁড় ভয়ঙ্কর শিং দুটো কাত করে ঝোপ ঠেলে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

যেই দেখা, দিশেহারা হয়ে একলাফে কী ভাবে সেই পাঁচিলে উঠে পড়লুম, জানি না। কর্ণেল আমার কাছে এগিয়ে এলেন। ষাঁড়টা ততক্ষণে আমাদের নিচে, শিঙ নেড়ে গাঁক গাঁক করছে।

এই সময় একটা লোক বেরিয়ে এল ওপাশের ঘর থেকে।

ব্যাপারটা তার চোখে পড়তেই সে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর ব্যস্ত হয়ে ডাকাডাকি শুরু করল। আরও জনা তিনচার লোক বেরিয়ে এল। একজন চেঁচিয়ে বলল—টুপি! টুপি! আপনার লাল টুপিটা লুকিয়ে ফেলুন!

এতক্ষণে ষাঁড়টার রাগের কারণ বোঝা গেল! কর্নেল অপ্রস্তুত হয়ে তক্ষুণি ওঁর লাল টুপিটা পকেটে লুকিয়ে ফেললেন। লোকগুলো ষাঁড়টাকে বশ মানাতে ব্যস্ত হল।...

আজকাল গ্রামাঞ্চলে অনেক জায়গায় কী এলাহি কারবার হচ্ছে, ভাবা যায় না! খবরের কাগজের চাকরির সুবাদে এরকমের ফার্ম দেখা ছিল। তবে ভূমিলক্ষ্মী ফার্ম তেমন বড় প্রজেক্ট নয়। মাঝারি ধরনের একটা কমপোজিট ইউনিট এবং নিছক প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজ। মালিকের নাম হেমাঙ্গভূষণ নায়েক। শক্ত সমর্থ প্রৌঢ় মানুষটি খুবই অমায়িক। ঠাকুর্দার আমলে জমিদারি ছিল। বাবা ছিলেন জোতদার। উনিও তাই—তবে প্রচলিত অর্থে নয় চাষবাসের সঙ্গে আছে ফিশারি আর ডেয়ারি। তিরিশটা দুধেল ভাল জাতের গরু আছে। দৈনিক গড়ে পাঁচ-সাত মণ দুধ হয়। ভোরবেলা নিজের স্টেশনওয়াগনে রামপুরহাট থেকে রেলে কলকাতা চালান দেন। কথায় কথায় অসুবিধাগুলো জানালেন—রিপোর্টার সামনে পেলে যা হয়। ব্যাঙ্কের দেনা শোধ করা যাচ্ছে না। সেচব্যবস্থার দিকে সরকার আদৌ মন দিচ্ছেন না, শুধু বক্তৃতাই সার। তার ওপর মফস্বলের বিদ্যুৎ বিভ্রাট তো লেগেই আছে। ঘনঘন লোড শেডিং হয়। ফার্মে লোকসানের অঙ্ক ফুলে ফেঁপে উঠছে দিনে দিনে।

কর্নেল উসখুস করছিলেন অনেকক্ষণ থেকে। উনি একটু থামতেই বললেন—আপনার ষাঁড়টা খুব রসিক মনে হচ্ছে হেমাঙ্গবাবু!

হো হো করে হাসলেন হেমাঙ্গ।—রসিক? মোটেও না স্যার! ব্যাটা যত বদরাগী তত খুনে! খুব ভাল জাতের ষাঁড় হলে কী হবে? অচেনা লোক দেখলেই গোঁজ উপড়ে আগর ভেঙে তাড়া করবে। এই

কমাস তিন-তিনটে লোককে জখম করেছে।

আমি বললুম—লাল রং'ওর চক্ষুশূল। তাই না হেমাঙ্গবাবু?

কর্ণেল বলে উঠলেন—জয়ন্ত, তুমি স্পেনের ষাঁড়ের লড়াই সম্পর্কে হেমিংওয়ের বই পড়ে দেখো। লড়ুয়েদের বলে মাতাদোর। তাদের হাতে থাকে লাল কাপড় আর একটা তরোয়াল। লাল কাপড় দেখিয়ে ষাঁড়কে ক্ষেপিয়ে দেয়। তারপর…

হেমাঙ্গ বাধা দিয়ে বললেন—স্পেন বলুন, বাংলাদেশ বলুন, ষাঁড় ইজ ষাঁড়! আর লাল কাপড় বলছেন! এই যে, এই দেখুন না—আজ দুপুর বেলা আমার কী দশা করেছে! মনিব বলেও খাতির করে না ব্যাটা। যেই আদর করতে গেছি, অমনি শিং মেরে বসল। ভাগ্যিস পাঞ্জাবি ছিল গায়ে, খানিকটা কাপড়ের ওপর দিয়ে গেল। নয়তো ভুঁড়ি ফেঁসে যেত? যাই বলুন স্যার, ষাঁড় ইজ ষাঁড়। লাল কাপড় কোন কথা নয়।

উনি হাসতে হাসতে ওঁর সাদা টেরিকটনের পাঞ্জাবির নিচের দিকটা দেখালেন। নিচের ঝুলের জায়গায় পকেটের কাছে দু ইঞ্চিটাক লম্বা ও এক ইঞ্চি চওড়া ফাঁক। ষাঁড়ের শিঙে উড়ে গেছে। কর্ণেলের নির্ঘাৎ ভীমরতি ধরেছে উনি একেবারে মুখটা এগিয়ে সেই ফাঁকটা দেখে নিলেন এবং আঙুলে ফাঁকটা পরখও করলেন—যেন সত্যি না মিথ্যে, তাই দেখছেন। হেমাঙ্গবাবু বললেন—পাঞ্জাবিটা পুরনো। ওর দোষ নেই। একটুতেই ফরফর করে ছিঁড়ে যায়। এই দেখছেন না? বুকের কাছে কেমন ফেটেফুটে গেছে!

আমার অবাক লাগল। পাড়াগাঁয়ে মানুষ এখনও কত সরল আর সাদাসিদে! এতবড় ফার্মের মালিক, অথচ তার জন্য এতটুকু দেমাক বা সাজগোজের ঘটা নেই। ছেঁড়া জামা পরেই কাটাচ্ছেন।

কর্ণেল হঠাৎ বললেন—আপনার দেখছি পান খাবার অভ্যেস আছে!

হেমাঙ্গবাবু যেন চমকে উঠলেন।—পান? না তো! বলেই

নিজের জামাটা বুকের কাছে দেখে নিয়েই আবার হো হো করে হাসলেন।—ও হ্যাঁ। মানে—মাঝে মাঝে খাই। কদাচিৎ!

আমি হাসতে হাসতে বললুম—একটু আগেও খেয়েছেন কিন্তু!

নিজের জিভ বের করে আত্মভোলা মানুষটি দেখে নিলেন। তারপর আবার সেই প্রাণখোলা হাসি।—কী কাণ্ড! খেয়ালই নেই! তাও বটে। দুপুরে এক পানখোর এসেছিল। কেন্দ্রহাটার নরহরিদা। তার কাছেই সখ করে একটা খিলি নিয়েছিলুম। দেখছেন কাণ্ড! জামাটা কী বিচ্ছিরি হয়ে গেছে! পাঁচু! ও পাঁচু!

ডাক শুনে একটা লোক এল। উনি জামাটা খুলে ওকে দিয়ে বললেন—এটা কেচে দে তো বাবা! এক্ষুণি কেচে দে।

পাঁচু বলল—এই সন্ধ্যেবেলা কেচে কী হবে গো? কাল সকালে দেব'খন।

হেমাঙ্গ তক্ষুণি রেগে বললেন—সকাল পর্যন্ত থাকলে আর কি দাগ উঠবে? যা—এক্ষুণি কেচে ফ্যাল।...তারপর কর্ণেলের দিকে ঘুরে বললেন—তাহলে আপনার কথাই সত্যি স্যার। পানের লাল রং কাপড়ে দেখেই ব্যাটা তখন ক্ষেপে গিয়েছিল আমার ওপর। ঠিকই বলেছেন আপনি।...

এই ভাবে আমাদের কথাবার্তা চলতে থাকল। একসময় হেমাঙ্গবাবুর মিস্ত্রি এসে জানালো, আমার গাড়িটা ঠিক হয়েছে। শুনে উঠে দাঁড়ালুম। বললুম—তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ হেমাঙ্গবাবু। চলি। আসুন কর্ণেল!

কর্ণেল কী যেন ভাবছিলেন—মুখটা গম্ভীর। বললেন—যাব?

হ্যাঁ। কাল সকালের মধ্যে কলকাতা পৌঁছতেই হবে।

কর্ণেল হেমাঙ্গবাবুর দিকে ঘুরে বললেন—ইয়ে, হেমাঙ্গবাবু! নদীর ওদিকে বেশ জঙ্গল দেখলুম। নানা জাতের পাখির আড্ডা। আমার আবার পাখি দেখার প্রচণ্ড বাতিক। তাই ভাবছিলুম...

হেমাঙ্গবাবু নীরস কণ্ঠস্বরে বললেন—পাখি? পাখি দেখবেন?

পাড়াগেঁয়ে পাখি সব—আপনারা শহুরে মানুষ, ভাল লাগবে? তাছাড়া স্যার, এই মাঠের মধ্যে চাষাভুষো হয়ে থাকি। আপনাদের অনেক কষ্ট হবে হয়তো।

স্পষ্ট বুঝলুম হেমাঙ্গবাবুর পক্ষে ঝামেলা হবে, যদি আমরা থাকি। ঝামেলা তো নিশ্চয়। এমন অতিথিদের জন্যে বিছানাপত্র, ঘর ইত্যাদির সুব্যবস্থা তো চাই। অথচ কর্ণেল যেন মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে চান। অদ্ভুত বেহায়া লোক তো! এমন স্বভাব কখনও দেখি নি কর্ণেলের! খুব বিরক্ত হয়ে বললুম—পাখি দেখতে হলে ক্যাম্প-ট্যাম্প সঙ্গে নিয়ে আসবেন কর্ণেল। এখন ওঠা যাক্। রাত বেড়ে যাচ্ছে।

কর্ণেল বেহায়া হয়ে বললেন—আরে, তুমি হেমাঙ্গবাবুকে অমন অভব্য ভাবছ কেন? আমাদের দেশের মানুষ খুব অতিথিবৎসল, সজ্জন। হেমাঙ্গবাবু, কোন রকম ব্যস্ত বা উদ্বিগ্ন হবার দরকার নেই। আমরা খোলা ওই বারান্দায় শোব। সঙ্গে কিছু খাবার আছে—আপনার অসুবিধে হবে না।

হেমাঙ্গবাবু হন্তদন্ত হয়ে জিভ কেটে বললেন—আরে ছি ছি! আমি কি তাই বলছি? আপনাদের মতো মানুষ পাওয়া ভাগ্যের কথা! ওরে পাঁচু! হারাধন মকবুল!

উনি ব্যস্তভাবে ডাকাডাকি করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। আমি রাগে বিরক্তিতে ফুঁসে উঠলুম। চাপা গলায় বললুম—আপনার নির্ঘাৎ ভীমরতি ধরেছে, কর্ণেল! ছিঃ! এমনি ভাবে যেচে পড়ে থাকার কোন মানে হয়? আর কখনো আপনার সঙ্গে কোথাও যাব না।

কর্ণেল যেন ধ্যানে বসে চোখ বুজেছেন। আমার কথা শেষ হলে চোখ খুলে বললেন—তুমি কি কিছু বলছ জয়ন্ত?

না, কিছু বলি নি।

বুড়ো মৃদু হাসলেন।—বৎস জয়ন্ত, ফার্মহাউসে রাত কাটানোর মধ্যে যে রোমাঞ্চ আছে, যে থ্রিল এ্যাণ্ড সাসপেন্স আছে—তা তুমি

এ যাবৎ কোথাও পাও নি। আই প্রমিজ এ্যাণ্ড এ্যাসিওর ইউ।

কিসের প্রতিজ্ঞা এবং প্রতিশ্রুতি তা আর জিগ্যেসও করলুম না, এত বেশি রেগে গেলুম। কর্ণেল ততক্ষণে আবার চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়েছেন। উঃ! এই পাগলের হাত থেকে কী ভাবে উদ্ধার পাব কে জানে!

পাশাপাশি ছুটো ঘর। পেছনের ঘরটায় ছুটো খাটিয়া ছিল। নিশ্চয় পাঁচুরা শোয়। সেখানে মোটামুটি রকমের বিছানায় ছুজনে শুয়ে পড়লুম, তখন রাত সাড়ে দশটা। জানলাগুলো খোলা। কোন ঘরেই ফ্যান নেই। হেমাঙ্গবাবু বিলাসী মানুষ নন। মিটমিটে বাল্বটা নিভিয়ে দিলুম। কর্ণেলের নাক ডাকতে শুনলুম সঙ্গে সঙ্গে। আশ্চর্য তো! এমন করে ঘুমোতে কখনও দেখি নি। গরমে আমার ঘুম এল না। জানলার বাইরে গেটের বাল্বটা অল্প আলো দিচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে এলোমেলো ভাবছিলুম।

গতকাল বিকেলে ব্রিজের কাছে গাড়ি খারাপ হওয়ার পর থেকেই কর্ণেলের আচরণ কেমন অস্বাভাবিক লাগছে। ভূতগ্রস্তের মতো বাইনোকুলার চোখে রেখে জঙ্গলে ঢুকে যাওয়ার দৃশ্যটা মনে পড়ছিল। আমার কথায় কানই দিলেন না—কেমন নাকবরাবর হেঁটে চলে গেলেন। তারপর দেখলুম, ফার্মের পাঁচিলে উঠে পড়েছেন ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে। ষাঁড়ের পাল্লায় পড়তে গেলেন কেন হঠাৎ? ষাঁড়টা তো ফার্মের মধ্যেই ছিল। কেন ঢুকলেন ফার্মে? কোন বিরল জাতের পাখিকে অনুসরণ করেই কি?

হ্যাঁ, তাই সম্ভব। তাই যেচে পড়ে থাকতে চাইলেন ফার্মে। তার মানে কালও আমার বেরনো হচ্ছে না। নিশ্চয় সেই ছুর্লভ পাখির খোঁজ করবেন সকাল থেকে। খুব ঝামেলা করছে বুড়ো। এবার কোনমতে কলকাতা ফিরলে আর ওর নাগালের মধ্যে যাব না।

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে গেছি। তারপর যখন ঘুম ভাঙল, চোখ খুলে দেখি প্রচণ্ড অন্ধকার। জানলা দিয়ে গেটের আলোটা আসছে না। নিশ্চয় লোডশেডিং।

কর্ণেলের নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলুম না। তাহলে উনিই জেগে আছেন। চাপা গলায় ডাকলুম—কর্ণেল, জেগে আছেন নাকি?

কোন সাড়া নেই। আরও তিনবার ডেকে সাড়া না পেয়ে উঠলুম। ওঁর বিছানায় হাত বাড়িয়ে টের পেলুম, বুড়ো নেই। তাহলে নৈশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন! এমন উৎকট সখ উনি ছাড়া কারও থাকতে পারে না।

খুব গরম লাগছিল। সিগ্রেট ধরিয়ে যতক্ষণ না সেটা শেষ হল, চুপচাপ বসে থাকলুম খাটিয়ায়। তখনও কর্ণেলের কোন সাড়াশব্দ নেই। ঘড়ি দেখলুম। রাত দুটো পাঁচ। তারপর দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি, দরজা খোলা। বারান্দায় গেলুম। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করেও কর্ণেলের পাত্তা নেই। ল্যাট্রিনটা বাগানের কোণার দিকে রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে কাকেও দেখলুম না। আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ঘরে ফিরে এলুম। বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে আবার সিগ্রেট ধরালুম। সিগ্রেটটার আধখানা পুড়েছে, হঠাৎ বাইরে কোথাও কর্ণেলের ভয়ার্ত চিৎকার শোনা গেল—হেমাঙ্গবাবু! জয়ন্ত! হেল্প! হেল্প!

তক্ষুণি চেঁচিয়ে সাড়া দিলুম—কর্ণেল! কর্ণেল! কী হয়েছে?

তারপর মনে পড়ল, আমার কিটব্যাগে একটা টর্চ আছে। টর্চটা বের করে দৌড়ে বাইরে বেরোলুম। বাগানের পশ্চিম দিকে টর্চের আলো জ্বেলেছে কে। সেই আলোয় দেখলুম, কর্ণেল আবার সেই পাঁচিলে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড নাচছেন এবং চীৎকার করে যাচ্ছেন।

আমার টর্চের আলো মুহূর্তে যা দেখাবার দেখিয়ে দিল। সেই ষাঁড়টা! শিঙ নেড়ে পাঁচিলের নিচে লম্ফঝম্প করছে। শিঙে

পাঁচিলটাকে গুঁতোচ্ছে। সামনের দু পায়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে। রাগব, নাকি হাসব—ভেবে পেলুম না। রাত দুপুরে কর্ণেল আবার সেই একই ব্যাপার কেন ঘটিয়ে বসলেন, এটাই বড্ড অদ্ভুত!

হেমাঙ্গবাবুর লোকেরা ততক্ষণে হেরিকেন জ্বেলে এনেছে। হেমাঙ্গবাবুর হাতে টর্চ। উনি চেঁচাচ্ছেন—ভূষণ! ফাঁস নিয়ে এসো! ফাঁস!

বিকেলের মতোই ষাঁড়টাকে কজনে মিলে কায়দা করে ফেলল। তারপর টানতে টানতে আগড় গলিয়ে বেড়ার মধ্যে ঢোকাল। তখন কর্ণেল লাফ দিয়ে নামলেন। নেমেই বললেন হেমাঙ্গবাবু! আপনার মেন সুইচ পরীক্ষা করে দেখুন তো শিগগির!

হেমাঙ্গবাবু হাসতে হাসতে বললেন—দেখব কী। এ তো সব সময় হচ্ছে। লোডশেডিং। কিন্তু স্যার, আপনি কীভাবে এখন রামুর পাল্লায় পড়লেন?

সেই সঙ্গে আমি বললুম—এখন অন্ধকারে লাল টুপিও দেখা যায় না। তা ছাড়া এখন লালটুপি আপনার পরার কথাও নয়।

কর্ণেল কোন জবাব না দিয়ে হনহন করে এগোচ্ছিলেন। ওঁর মুখটা কেমন গম্ভীর। হেমাঙ্গবাবু ও আমি ওঁকে অনুসরণ করলুম। বারান্দায় এগিয়ে যেতে যেতে কর্ণেল একখানে দাঁড়ালেন। বললেন—হুম! এখানেই তো মিটার বোর্ড ছিল মনে হচ্ছে!

হেমাঙ্গবাবু বললেন—হাঁ স্যার। ওই যে, কোণায়। কিন্তু...

কর্ণেল মেনসুইচের কাছে গিয়ে অস্ফুটে বললেন—মাই গুডনেস!

তারপরই আলো জ্বলে উঠল গেটে। হেমাঙ্গবাবু অবাক হয়ে বললেন—সে কী! মেনসুইচ অফ করেছিল কে?

কর্ণেল কথা বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছেন, হঠাৎ ষাঁড়ের বেড়ার দিক থেকে হেমাঙ্গবাবুর লোকেরা উত্তেজিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল—বাবু! বাবু! শিগগির এখানে আসুন, শিগগির!

এবার সবার আগে কর্ণেলকে দৌড়তে দেখলুম। বাগানের

একাংশে বেড়া, বেড়ার মধ্যে ষাঁড়ের খোয়াড়। ষাঁড়টা গোয়ালের গাদায় মুখ ঢুকিয়ে ভোজনে ব্যস্ত। আর হেরিকেনের আলোয় লোকগুলো কিছু ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

গিয়ে যা দেখলুম, স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। একটা মধ্যবয়স্ক লোক চিত হয়ে পড়ে আছে। তার পরণে ময়লা ধুতি, গায়ে ফতুয়া মতো জামা। তার বুকে কলজের কাছটায় চাপচাপ রক্ত। হেমাঙ্গ চেঁচিয়ে উঠলেন—নরহরিদা! এ যে নবহরিদা! সর্বনাশ! মারা গেছে নাকি?

কর্ণেল হাঁটু দুমড়ে লোকটাকে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে বললেন—অনেকক্ষণ আগে মারা গেছে! কিন্তু···ইনি এখানে কোত্থেকে এলেন?

হেমাঙ্গবাবু প্রায় হাউমাউ করে কেঁদে বললেন—এ হবে আমি জানতুম! ওই অলক্ষুণে বদমাস ষাঁড় খুন খারাপি না করে ছাড়বে না—ঠিক বলেছিলুম। বাবা চণ্ডী! ছাখ তো, ওর শিঙে রক্তটক্ত লেগে আছে নাকি।

টর্চ ফেললুম আমি। হ্যাঁ—ষাঁড়টার ডান শিঙে রক্ত থকথক করছে। কর্ণেল বললেন—কী সর্বনাশ! হেমাঙ্গবাবু, ইনি নিশ্চয় আপনার কোন কর্মচারী?

হেমাঙ্গবাবু বললেন—না স্যার। উনি কেন্দুহাটার নরহরি দাশমশাই। খুব বড় ব্যবসায়ী। রামপুরহাটেও ওর কাঁসাপেতলের কারবার আছে। ইদানীং এই মাঠে অনেকটা জমি কিনেছিলেন নরহরিদা। আমার মতোই ফার্ম করার ইচ্ছে ছিল। ছেলেরা লায়েক হয়ে ব্যবসা দেখছে। উনি নিজে ফার্ম দেখবেন, এই ছিল মতলব। তাঁর ওপর সম্প্রতি বিহারে হিরণপুরের গোহাটা থেকে এক গাই গরু কিনেছিলেন। কে ওঁর মাথায় ঢুকিয়ে দিল কে জানে, আমার মতো ডেয়ারি খুললে খুব পয়সা হবে। তাই আমার কাছে কদিন ধরে খুব যাতায়াত করছিলেন।

কর্ণেল বললেন—কিন্তু এখানে ষাঁড়ের খোঁয়াড়ে রাতদুপুরে…

বাধা দিয়ে হেমাঙ্গবাবু বললেন—বলছি, স্যার। বড্ড একগুঁয়ে মানুষ নরহরিদা। মাথায় যখন ডেয়ারি ঢুকেছে, তখন রক্ষে নেই। ওদিকে হাড়কিপটে—বড্ড কৃপণ, বুঝলেন? দুটো গরু থেকেই কয়েকশো গরুর স্বপ্ন এসেছে মাথায়। তাই একটা ভালোজাতের ষাঁড় চাই। আমার ষাঁড়টা বেজায় পছন্দ। সবসময় এসে সাধাসাধি করছিলেন, ষাঁড়টা যেন ওঁকে বেচে দিই। কেন দেব, বলুন স্যার? সখ করে কিনেছি।

কর্ণেল বললেন—হুম্! কিন্তু রাতদুপুরে ষাঁড়ের খোঁয়াড়ে…

হেমাঙ্গবাবু ফের বাধা দিয়ে বললেন—স্যার, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু—কথায় বলে। নিশ্চয় উনি ষাঁড়টা চুরির মতলবে এসেছিলেন। তাছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে?

কর্ণেল মাথা নেড়ে বললেন—উঁহু! চুরি করলে তো ধরা পড়ে যাবেন! ষাঁড় চুরি করা কি সম্ভব?

হেমাঙ্গবাবু ব্যস্তভাবে বললেন—ঠিক বুঝতে পারলেন না স্যার! একেবারে চুরি নয়। ষাঁড়টা নিয়ে গিয়ে একটা দিন লুকিয়ে রাখতেন এবং তাতেই ওঁর গরু দুটো প্রেগন্যান্ট হতো! ভালো জাতের দুধেল গরুর জন্ম হতো!

—সে তো আপনাকে অনুরোধ করলেই হতো।

—হতো না স্যার! অন প্রিন্সিপল্, আমি বাইরের কোন গরুর জন্য ষাঁড় তো দিতুম না। উনি অবশ্য আমাকে তাও অনুরোধ করেছিলেন। দেব কেন বলুন? একে তো কমপিটিশান—তার ওপর আমার ষাঁড়, আমি নগদ পাঁচ হাজার টাকায় কিনেছি। এটা প্রেসটিজেরও ব্যাপার কিনা! তাছাড়া এক জনকে দিতে হলে আরও সবাই চাইবে। আমি তো স্যার দেশসুদ্ধ ভালো গরু প্রোডিউস করার দায়িত্ব নিই নি। সরকারের সে ব্যবস্থা আছে। সবাই সরকারের কাছে যাক্। ব্লক আপিসে যাক্।…বলে হেমাঙ্গবাবু আচমকা ভেঙে পড়লে।—ও

নরহরিদা! এ তুমি কী করলে।

কেন্দ্রাহাটা থানার পুলিশ অফিসার হিতেন গুপ্ত জিপে চে
সদলবলে এলেন সকাল আটটায়। ষাঁড়ের শিঙের গুতোয় মৃত্যু—সুতরাং দুর্ঘটনার একটা সাধারণ তদন্ত ছাড়া আর কীই বা হবে হিতেনবাবু হেমাঙ্গবাবুকে একচোট শাসাতে ভুললেন না।—তিনবে জখম, তারপর এই দেখ। ওই খুনে ষাঁড় আপনি শিগগির বিদে করুন মশাই। নৈলে ভীষণ বিপদে পড়বেন।

হেমাঙ্গবাবু অনুনয় বিনয় করে দারোগাবাবুকে শান্ত করলেন আড়ালে ডেকেও নিয়ে গেলেন। তার মানে যা বোঝার, সবাই বুঝল। নরহরিবাবুর মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণ দিতেও চাইলেন। কিন্ত নরহরিবাবুর ছেলেরা তা নেবে কেন? তাদের অঢেল পয়সা আছে ক্ষতিপূরণ নেওয়াটা অপমানজনক। তাছাড়া এ তো লজ্জার কথা বটে। বাবা ষাঁড় চুরি করতে এসেছিল! খিটকেল কি কম হবে তিন ছেলের মধ্যে ছোটটা ভীষণ রাগী। সে শাসালো—আজ ষাঁড়টাকে গুলি না করে জলগ্রহণ করবে না। হেমাঙ্গবাবু করজোড়ে ক্ষমা চাইতে থাকলেন।

গ্রাম থেকে অনেক মাতব্বর লোকেরা এসেছিলেন। তাঁর মধ্যস্থ হয়ে সব মীমাংসা করে দিলেন। নরহরিবাবুর নিয়তি—তা ন হলে অমন মানুষ রাত দুপুরে ষাঁড় চুরিই বা করতে আসবেন কেন নিশির ডাকে বেচারাকে ঘর ছাড়া করেছিল। কেউ কেউ জনান্তিকে বলল—পিঁপড়ের পাছা থেকে গুড় তুলে খায়, এমন কিপটে লোক পয়সার লোভ বড্ড। তাই ষাঁড় চুরি করতে এসেছিল।

লাশ যথারীতি মর্গে গেল। দারোগাবাবু কর্ণেলকে পাত্তাই দিলেন না। কর্ণেল গতিক বুঝে কাঁচুমাচু মুখে সরে এলেন। আমি ব্যাপারটা দেখে খুব হাসলুম।

বেলা তখন সাড়ে দশটা। সব চুকে গেছে। দারোগা লাশ

নিয়ে চলে গেছেন। ভিড় সরেছে। কর্নেল একটা শিরিষ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ফার্মের একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললুম—আর কী? এবার বেরোনো যাক।

কর্নেল আমার হাত ধরে টানলেন। লোকটা চলে গেল। একটু এগিয়ে এক জায়গায় দাঁড়ালেন কর্নেল। তারপর বললেন—জয়ন্ত কি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছ?

—নিশ্চয়। আপনার মতো বাহাত্তুরে ধরে নি তো আমাকে!

—জয়ন্ত, জয়ন্ত! তুমি রাগ করছ। কিন্তু বাহাত্তুরে হয়তো তোমাকেই ধরেছে।

—মোটেও না। আসলে আপনার মাথায় গোয়েন্দাপোকা কামড়াচ্ছে। স্রেফ দুর্ঘটনাকেও আপনি মেনে নিতে পারছেন না। কারণ, আপনার স্বভাব শকুন যেমন মড়া দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেমনি আপনিও……

—জয়ন্ত, জয়ন্ত! আমাকে শকুন বলছ?

—বলব। একশোবার বলব।

—হ্যাঁ, আমি শকুনই বটে। আমার চোখে শকুনের দৃষ্টিশক্তি আছে, ডার্লিং! —অস্বীকার করছি না। তাই তো, কাল বিকেলে কেন আমি তোমার গাড়ি বিগড়ানো দেখেও দেখলুম না? কেন আমি শকুনের মতো নদীর ধারে জঙ্গলের দিকে চলে গেলুম—তোমার কথার কোন জবাব না দিয়েই কেন চলতে থাকলুম?

—নির্ঘাৎ চরে মড়া দেখেছিলেন?

—ঠিক বলেছ, জয়ন্ত। তবে মড়া তখনও দেখি নি, শুধু গন্ধ টের পেয়েছিলুম। টনক নড়েছিল।

চমকে উঠে বললুম—তার মানে? মড়ার গন্ধ—দ্যাট ইজ ডেডবডি! মার্ডার! কর্নেল হাসলেন।—আচ্ছা জয়ন্ত, গতকাল বিকেলে তুমি ষাঁড়টা দেখেছিলে, গতরাতে দেখেছ, এবং আজ

সকালেও দেখেছ। কোন অদ্ভুত কিছু চোখে পড়ে নি?

—না তো!

—ষাঁড়ের শিঙে বিকেলে কোন পেতলের ছুঁচলো ডগাওয়াল টুপি পরানো ছিল না। অথচ রাতে যখন ষাঁড়টা দেখলুম, তখন টুপি পরানো আছে। তাতে রক্ত আছে।

বাধা দিয়ে বললুম—তাই তো বটে!

—তার মানে সন্ধ্যার পর কোন একসময় শিঙে ছুঁচলো টুপি পরানো হয়েছিল।

—কিন্তু হঠাৎ অমন তীক্ষ্ণ ধারালো টুপি পরানো হল কেন?

কর্নেল সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন—জয়ন্ত, কাল রাতে আমি জেগে ছিলুম। নাক ডাকানোটা নেহাৎ কৌশল। ঘুমনো সম্ভব ছিল না, জয়ন্ত। আমি একটা ডেডবডির কথা ভাবছিলুম। যে ডেডবডির গন্ধ পেয়ে নদীর চরে গিয়েছিলুম, সেটা দেখার অপেক্ষায় ছিলুম।

—তার মানে? ডেডবডির কথা কেন ভাবছিলেন? তখন ডেডবডি কোথায়?

—কাল বিকেলে নদীর চরে একজনকে চুপি চুপি বালি সরাতে দেখছিলুম। বাইনোকুলারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, সে কিছু একটা পুঁতছে। তাই দৌড়ে সেদিকে এগোলুম। যেতে যেতে লোকটা কাজ শেষ করে পালাল। তখন খুঁজতে খুঁজতে আবিষ্কার করলুম, লোকটা বালিতে একটা লোহার গোঁজ লুকিয়ে রেখে গেল। দেড়ফুট লম্বা, একইঞ্চি মোটা গোঁজ—যা দিয়ে গরু বাধা খুটি হয়। গোঁজের ডগায় টাটকা রক্ত দেখে এমন টের পেলুম, কী ঘটেছে।

—বলেন কী!

—স্পষ্ট জানলুম, এটা একটা মার্ডার উয়েপন। অথচ জঙ্গলে ঢুকে বা চরে কোথাও ডেডবডি পেলুম না। তখন বোঝ আমার মনের অবস্থা! এখানে এই ফার্ম ছাড়া কোন বসতি নেই। তাই সন্দেহ

ক্রমে ঢুকে পড়লুম ফার্মে। ঢুকেই পড়ে গেলুম ষাঁড়ের পাল্লায়।

—তাহলে আপনি সেজন্যেই ফার্মে যেচে পড়ে থাকতে চাইলেন?

—হ্যাঁ জয়ন্ত। ডেডবডিটা আবিষ্কার করা জরুরী ছিল। তবে ষাঁড়টা প্রথমে দেখেই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল। খুনের পদ্ধতি অর্থাৎ মডাস অপারেণ্ডি এবং এ্যালিবাই কী ধরনের হবে, সঙ্গে সঙ্গে আঁচ করে নিয়েছিলুম। তারপর হেমাঙ্গবাবুর জামায় পানের দাগ দেখলুম। অথচ উনি মুখ ফসকে বলে ফেললেন, পান খান না। তখন সব স্পষ্ট হল।

—তাহলে ওগুলো কি রক্তের দাগ?

—হ্যাঁ। আর ওই জামা ছেঁড়ার ব্যাপারটা ষাঁড়ের শিঙে ঘটে নি।...বলে কর্ণেল পকেট থেকে একটা সাদা কাপড়ের ছোট্ট টুকরো বের করলেন।—এই সেই টুকরো! এটা নরহরিবাবুর হাতের মুঠোয় ছিল। কাল রাতে লাশ পরীক্ষার সময় এটা ওঁর মুঠোয় পেয়ে গিয়েছিলুম। তার মানে, খুব ধস্তাধস্তি হয়েছিল। খুনের সময় হেমাঙ্গবাবুর জামাটা কত জায়গায় ছেঁড়া দেখেছ, আশা করি এখনও ভোল নি।

শুনতে শুনতে আমি স্তম্ভিত। এদিক ওদিক তাকিয়ে বললুম—কিন্তু এত সব প্রমাণ পেয়েও পুলিশকে কিছু বললেন না?

কর্ণেল দুঃখিত মুখে বললেন—বলেও লাভ হতো না জয়ন্ত। দারোগা ভদ্রলোক সৎ মানুষ নন। উল্টে আমাদেরই হয়রান করতেন। মাঝখান থেকে কোন প্রমাণই কাজে লাগাবার সুযোগ পেতুম না। দুর্নীতিবাজ অফিসার হলে যা হবার, তাই হতো। এই কাপড়ের টুকরো, লোহার গোঁজ—সবকিছু লোপাট হয়ে যেত। তার চেয়ে আমি এখনই রামপুরহাট পুলিশ সুপারের কাছে যেতে চাই। গাড়ি বের করো। শিগগির!

গাড়ি বের করলুম। হেমাঙ্গবাবুর কাছে বিদায় নিলুম।

এবার উনি কিছুতেই আসতে দেবেন না। অনেক সাধাসাধি করলেন। মনে মনে বললুম—শয়তানের কাজ চুকে গেছে। এখন আমাদের উপস্থিতি তো আর বাধা সৃষ্টি করবে না।

পথে আসতে আসতে বললুম—গতরাতে কেন বেরিয়েছিলেন বললেন নি কিন্তু।

কর্ণেল জবাব দিলেন—একটা লাশ কখন ষাঁড়ের খোঁয়াড়ে ঢোকানো হবে, তাই দেখতে। কিন্তু আমার উপস্থিতি টের পেয়ে গেল ব্যাটা। অমনি ষাঁড়টাকে আগড়ের বাইরে ঠেলে দিল। ষাঁড়টা বদমেজাজী সন্দেহ নেই। তক্ষুণি তেড়ে এল।

—মেনসুইচ অফ করাটা নিশ্চয় চোখে পড়েছিল আপনার?

—হ্যাঁ। হঠাৎ গেটের আলো নিভলেই আমি বেরিয়ে পড়েছিলুম। টের পেয়েছিলুম, লাশটা এবার আমার অজ্ঞাত কোন গুপ্তস্থান থেকে আনা হচ্ছে।

কতক্ষণ চুপচাপ থাকার পর জিগ্যেস করলুম—কিন্তু মোটিভ কী খুনের?

কর্ণেল একটু হাসলেন—নরহরিবাবুর ছেলেদের কথাবার্তা কান দিয়ে শোন নি, বিশেষ করে ছোট ছেলেটার কথা? মহাজনী কারবার ছিল নরহরিবাবুর। তাই অনুমান করছি, হেমাঙ্গবাবুর কাছে অনেক টাকা সুদে-আসলে নিশ্চয় পাওনা হয়েছিল। অথচ এসব কারবার গ্রামাঞ্চলে কোনরকম খাতা কলমে হয় টয় না। বিশেষ করে এক সময়ে জমিদার বংশের লোক ছিলেন হেমাঙ্গবাবু। মুখের কথায় মহাজন টাকা দেয়। হেমাঙ্গবাবুর প্ল্যান ছিল, টাকা চাইতে এলেই খুন করবেন এবং ষাঁড়ের ওপর দায়টা চাপাবেন। খুব সহজ পদ্ধতি!

হেসে বললুম—ব্যাটা হেমাঙ্গভূষণ টেরও পাচ্ছে না যে কী ঘটতে চলছে?

কর্ণেল গম্ভীর হয়ে বললেন—নরহরিবাবুও টের পান নি যে কী

ঘটতে চলেছে! এই হয়, জয়ন্ত। যে খুন করে আর যে খুন হয়, তারা যেন কিছুক্ষণের জন্য বড্ড নিঃসাড় হয়ে পড়ে। মানুষের বোধ-বুদ্ধির এই নিঃসাড় বা ফ্রিজিং অবস্থার মধ্যেই শয়তানের আবির্ভাব ঘটে।

শেষ